উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা

দ্বিতীয় সেমেস্টার

উপন্যাস (উনিশ-বিশ শতক)

ঐচ্ছিক পত্র – ২০৫

পর্যায় – খ

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:

The Registrar,

University of North Bengal,

Raja Rammohunpur,

P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,

West Bengal, Pin-734013,

India.

Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008

Fax: (0353) 2776313, 2699001

Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in

Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায় ক

একক ১ চন্দ্রশেখর- প্রেক্ষাপট ও উপন্যাসের গঠন

একক ২ চন্দ্রশেখর- উপন্যাসের চরিত্র চিত্রণ

একক ৩ চন্দ্রশেখর- উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা

একক ৪ চন্দ্রশেখর- উপন্যাসের নিয়তির ভূমিকা ও

অলৌকিকতার পরিচয়

একক ৫ ঘরে বাইরে- ঔপন্যাসিক বৃত্তান্ত

একক ৬ ঘরে বাইরে- উপন্যাসের চরিত্র

একক ৭ ঘরে বাইরে- উপন্যাসের রাজনৈতিক সত্য

পর্যায় খ

একক ৮ পুতুল নাচের ইতিকথা- ঔপন্যাসিক বৃত্তান্ত

একক ৯ পুতুল নাচের ইতিকথা- চরিত্র চিত্রণ

একক ১০ পুতুল নাচের ইতিকথা- উপন্যাসে কুসুমের মনস্তত্ত্ব

একক ১১ পুতুল নাচের ইতিকথা- কুমুদ মতি উপাখ্যান

একক ১২ আরোগ্য নিকেতন- উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ও গঠন

একক ১৩ আরোগ্য নিকেতন- চরিত্র-চিত্রন

একক ১৪ আরোগ্য নিকেতন- নামকরণ

ঐচ্ছিক পত্র – ২০৫- উপন্যাস (উনিশ-বিশ শতক)

পর্যায় খ

একক ৮। পুতুল নাচের ইতিকথা- ঔপন্যাসিক বৃত্তান্ত – রচনাকাল, উপন্যাসের গঠন শৈলী, উপন্যাসের পটভূমি, উপন্যাসের নামকরণ, উপন্যাসে শশী কুসুম প্রসঙ্গ।

একক ৯। পুতুল নাচের ইতিকথা- চরিত্র চিত্রণ – শশী, কুসুম, মতি, কুমুদ, যাদব, গোপাল।

একক ১০। পুতুল নাচের ইতিকথা- উপন্যাসে কুসুমের মনস্তত্ত্ব - উপন্যাসে মৃত্যু চেতনা, মূল কাহিনী এবং গৌণ কাহিনীর যোগসূত্র।

একক ১১। পুতুল নাচের ইতিকথা- কুমুদ মতি উপাখ্যান - শশীর নিঃসঙ্গ মনস্তত্ত্ব বিচার, গল্পের নায়ক শশী এবং নায়িকা কুসুম এই বক্তব্যের যথার্থতা, ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব উপন্যাসের নায়িকা কুসুমের চালিকাশক্তি।

একক ১২। আরোগ্য নিকেতন- উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ও গঠন - উৎস, ঔপন্যাসিক বৃত্তান্ত, তারাশঙ্করের উপন্যাসিক বৈশিষ্ট্য, প্রতিবেশ ও প্রকৃতি উপন্যাসের প্রাণস্বরূপ।

একক ১৩। আরোগ্য নিকেতন- চরিত্র-চিত্রন - জীবন মশায়, প্রদ্যোত ডাক্তার, আতর বউ।

একক ১৪। আরোগ্য নিকেতন- নামকরণ, উপন্যাসে মৃত্যু চেতনা, আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে সার্থক কিনা।

একক ৮ পুতুল নাচের ইতিকথা- ঔপন্যাসিক বৃত্তান্ত

বিন্যাসক্রম

৮.১ ঔপন্যাসিক বৃত্তান্ত

৮.২ রচনাকাল

৮.৩ উপন্যাসের গঠন শৈলী

৮.৪ উপন্যাসের পটভূমি

৮.৫ উপন্যাসের নামকরণ

৮.৬ উপন্যাসে শশী কুসুম প্রসঙ্গ

৮.৭ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

৮.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৮.১ ঔপন্যাসিক বৃত্তান্ত

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন ১৯ শে মে ১৯০৮ সালে।তিনি ছিলেন একজন ভারতীয় বাঙালি কথাসাহিত্যিক।প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী জুড়ে মানবিক মূল্যবোধের চরম সংকটময় মূহুর্তে বাংলা কথা-সাহিত্যে যে কয়েকজন লেখকের হাতে সাহিত্যজগতে নতুন এক বৈপ্লবিক ধারা সূচিত হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। তার রচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল মধ্যবিত্ত সমাজের কৃত্রিমতা, শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম, নিয়তিবাদ ইত্যাদি। ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ ও মার্কসীয় শ্রেণীসংগ্রাম তত্ত্ব দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন যা তার রচনায় ফুটে উঠেছে। জীবনের অতি ক্ষুদ্র পরিসরে তিনি রচনা করেন চল্লিশটি উপন্যাস ও

তিনশত ছোটোগল্প। তার রচিত পুতুলনাচের ইতিকথা , দিবারাত্রির কাব্য, পদ্মা নদীর মাঝি ইত্যাদি উপন্যাস ও অতসীমামী , প্রাগৈতিহাসিক , ছোটবকুলপুরের যাত্রী ইত্যাদি গল্পসংকলন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে বিবেচিত হয়। ইংরেজি ছাড়াও তার রচনাসমূহ বহু বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

৮.২ রচনাকাল

১৩৪১ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা থেকে ১৩৪২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা পর্যন্ত "ভারত বর্ষ" পত্রিকায় 'পুতুল নাচের ইতিকথা' প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। এটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় উপন্যাস এবং চতুর্থ প্রকাশিত গ্রন্থ।

৮.৩ গঠন শৈলী

উপন্যাস মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি । সেই ছবি জীবনের গতিপথে কখনও এক থাকে আবার তা জীবনে বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতে পরিবর্তিত হয় । এই পরিবর্তন আপেক্ষিক এবং তা পরিলক্ষিত হয় অন্যান্য চরিত্রের এবং পটভূমিকার সাপেক্ষে । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার সকল উপন্যাসে মানুষের অন্তর এবং তার বাহিরের এক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তোলেন । এই উপন্যাসও তার ব্যাতিক্রম নয়। এই উপন্যাসে লেখক বিভিন্ন মানুষের মধ্যে অন্তঃসম্পর্ক এবং তাদের জটিলতা নিয়ে গঠন করেছেন এক বিশদ প্রেক্ষিত । তাদের নিজস্ব সময় এবং বাস্তবতার পটভূমিতে নিজেদের অস্তিত্ব স্বীকার করে তাঁরা এই জীবনের গল্প শোনায় । সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ , অর্থ-সামাজিক ব্যাবস্থায় তাদের অবস্থান এবং মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার সুনিপুণ রেখাচিত্র ফুটে ওঠে এই উপন্যাসে ।

মোট তেরোটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাস । এই সকল পরিচ্ছেদ তৈরি হয় একটি মানুষকে ঘিরে , যাকে এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হিসেবে গন্য করা যায় । সে শশী ডাক্তার । গাওদিয়া গ্রামের বাসিন্দা এবং তার মাধ্যমে পাঠক পরিচিত হয় অন্যান্য চরিত্রদের সাথে । এই উপন্যাসের গঠন কোন নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা নয় । যদিও প্রাথমিকভাবে এই গল্পের মূল প্লটটি একটু বৃত্তের ন্যায় মনে হতে পারে , কিন্তু গভীরে অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে মূল প্লট আসলে শশীর জীবন এবং তা অসম্পূর্ণ থেকে যায় যদি তার পারিপার্শ্বিক মানুষের উপস্থিতি আমরা অগ্রাহ্য করি । যেহেতু এই উপন্যাস প্রধানত মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, তাই এই উপন্যাসের গঠন একটি চরিত্রের ভিত্তিতে

গড়ে তোলা সম্ভব নয় । উপন্যাসের প্রত্যেক চরিত্রের সঙ্গে শশী ডাক্তারের অর্থাৎ যার মাধ্যমে আমরা গল্পে অগ্রসর হই, এক বা বহুমাত্রিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় , তার সাথে সাথে সেই সকল চরিত্রের নিজেদের মধ্যে এক সম্পর্ক বর্তমান যা প্লটটিকে আরও বড় এবং বহুমাত্রিক করে তোলে । আপাতভাবে বৃত্তাকার এই প্লটের মধ্যেই থাকে সরলরৈখিক সাব-প্লট , যেমন কুমুদ এবং মতির জীবন । আবার কুমুদ এবং মতির আলাদা সত্তা হিসেবে জীবনও উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করে তোলে । প্রত্যেক চরিত্র নিজেদের অস্তিত্বে এবং শশীর সাথে তাদের সম্পর্কে উপন্যাসে নিজেদের তাৎপর্য প্রতিষ্ঠা করে ।

উপন্যাসের শুরু হয় আকস্মিকভাবে । তার কোন ভুমিকা থাকেনা, পাঠক যেন আকস্মিকভাবে এই উপন্যাসের প্লটে এসে পড়ে । হারু ঘোষের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়, এবং তা দিয়েই লেখক শুরু করেন এই উপন্যাসের প্লট তৈরি । অনতিবিলম্বে প্রবিষ্ট হন গল্পের প্রাধান চরিত্র শশী ডাক্তার এবং অন্যান্য প্রধান চরিত্র যেমন মতি এবং পরান ।

অন্যদিকে কুসুম এই উপন্যাসের দ্বিতীয় প্রধান চরিত্র হিসেবে দেখা দেয় । তার এই উপন্যাসে প্রবেশ ভীষণ নির্লিপ্তভাবে।কুসুমের স্বভাব যেমন নির্লিপ্ত অথচ ভীষণ , ঠিক সেইরকমই লেখক কুসুমকে এই উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত করেন একটি বাক্যে । লেখক লিখছেন ‘‘কুসুম গিয়াছিল ঘাটে’ । সেই প্রথম উপন্যাসে কুমুমের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এটি । কুসুম এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র হলেও তার পরে গোটা সময় জুড়ে কুসুমের যে গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ চলবে তার কোনো আভাস উনি দেননি শুরুতে ।

এছাড়াও বিভিন্ন চরিত্রের সম্পর্ক গঠন করেন লেখক , যেমন কুমুদ এবং মতি , যেমন বিন্দু এবং নন্দলাল । বিশেষ করে বিন্দু এবং নন্দলালের জীবন থেকে লেখক সেই সময়ের যৌনবিলাসের যে ছবি তুলেছেন তা শশীকে বিশ্লেষণ করতে যেমন সাহায্য করে তেমনই তার পারিবার স্নেহের দিকটিও তুলে ধরেন । বিন্দুকে শশী এই সকল শহুরে কলাহল এবং বিকৃতি থেকে দূরে সরাতে চাইলেও বিন্দু নিজে মানিয়ে নিতে পারে না এই গ্রাম্য পরিবেশের সঙ্গে । সে ফিরে যায় তার শহরের জীবনে । শশী নিজেও একসময় ভেবেছে শহরে চলে যাওয়ার কথা , সে নিজেও সর্বক্ষণ ভাবতে থাকে গ্রাম্য পরিবেশে তার মানিয়ে নেওয়ার অসুবিধের কথা । বিন্দুর এই জীবন যেন তাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে কিছু কথা বলে যায়। এছাড়াও শশীর জীবনের যে সকল চরিত্রদের সে সমাদর করে, যাদের সে কিছুতেই অগ্রাহ্য করতে পারেনা ,

সেই সকল চরিত্রেরা ধীরে ধীরে তার থেকে দূরে চলে যেতে থাকে । সেন দিদি থেকে শুরু হয় এই যাত্রা । একে একে মতি, কুমুদ, সেন দিদি, যাদব পণ্ডিত , যামিনী কবিরাজ, পাগল দিদি এবং সবশেষে তার নিজের পিতা গোপাল ও তার জীবনের ভালোবাসার যেটুকু সে যার থেকে পেয়েছে সেই কুসুম তাকে ছেড়ে চলে যায় । লেখক মৃত্যুকে এই উপন্যাসের এক চরিত্র করে তুলেছেন যেন । তিনি যেন মৃত্যুর মাধ্যমে শশীকে নিজের প্রতিফলনের সামনে স্থপিত করতে চেয়েছেন । কেউ চলে গেছে জীবন থেকে, কেউ চলে গেছে গ্রাম থেকে , যাওয়ার আগে তাঁরা বলে গেছে , বিভিন্ন রুপকে , কখনও সরাসরি , শশী যেন ধরে নেয় তাদের মৃত্যু হয়েছে । অবশেষে লেখক উপন্যাসের প্রান্তে এসে শশীকে সম্পূর্ণ একা এবং চারিত্রিক দ্বন্দ্ব পরিপূর্ণ একটি চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন ।

এভাবেই এক চরিত্রের ধ্বনি , অন্য চরিত্রের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে । এভাবেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার এই উপন্যাসে চরিত্রদের মধ্যে নিপুণভাবে বুনেছেন তার প্লট । এভাবেই পুতুল নাচের ইতিকথা হয়েছে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সেরা উপন্যাসের একটি , এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত সেরা উপন্যাস । এ বিষয়ে দ্বন্দ থাকতেই পারে, কিন্তু এ উপন্যাসের মৌলিক নির্মাণ প্রসঙ্গে কোন দ্বন্দ্ব থাকে না ।

৮.৪ পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসের পটভূমি

পুতুলনাচের ইতিকথা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এক অমর উপন্যাস যা বাংলা সাহিত্যে নিজ আলোকে উজ্জ্বল । এই উপন্যাস ওনার লেখা দীর্ঘতম উপন্যাসও বটে । এই উপন্যাস তেরোটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এবং উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় শশী । এই উপন্যাসের সিংহভাগ ঘটে গাওদিয়া নামের এক গ্রামে , তবে শুধু গাওদিয়া নয় তার থেকে অনতিদূরে বাজিতপুর নামক একটি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে কখনও শশী আবার কখনও গোপাল তাদের বিভিন্ন কাজে নৌকো নিয়ে যাতায়াত করে । এই বাজিপুরেই কুসুমের বাপের বাড়ি এবং তার পিতা অনন্তের উল্লেখ এই উপন্যাসে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে ।

উপন্যাসের চরিত্রদের এই বাজিতপুর যাওয়া এবং সেখান থেকে ফিরে আশা পাঠককে এক স্থানিক রেখাচিত্র দেয় যার সাপেক্ষে এই উপন্যাসের এক রেখাচিত্র লেখক অঙ্কন করেন । এই গাওদিয়া লেখকের পূর্ব পরিচিত এবং তার প্রভাব উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে দেখতে পাওয়া যায় । গাওদিয়ার পরিবেশ , তার তারপুকুর , গাওদিয়ার মধ্যবর্তী খাল,

সেখানকার বেগুনখেত স্বয়ং যেন একাত্ম হয়ে যায় উপন্যাসের সাথে । এর জন্য লেখকের সুনিপুণ লেখনী এবং ততসহ তার সুস্পষ্ট এবং সুবিস্তৃত বিবরণ দায়ী । এই সকল অঞ্চল ছাড়াও উপন্যাসে কলকাতার উল্লেখ আছে যা গাওদিয়া থেকে বেশ দূরে , যেখানে সহজে যাওয়া যায়না । শশী ডাক্তারি পড়তে যায় কলকাতায় । সেখানে গিয়ে সে গ্রাম্য পরিবেশের বাইরে নতুন সভ্যতার আলো গায়ে মাখে এবং সে যেন নতুন খোলা হাওয়ার সামনে এসে পড়ে । তাই এই পরিবর্তনের জন্য যে মানুষ দায়ী তার নাম কুমুদ । সে বিশ্ব সাহিত্য নিয়ে চর্চা করে , নতুনকে সহজে আস্বাদন করতে পারে এবং সে শশীর সাথে এই নতুন পৃথিবীর পরিচয় করায় । শশীর আর গ্রামে ফিরতে ভালো লাগেনা , সেই গ্রামের পরিবেশে আবার ফিরে যেতে তার মন চায়না, তবু তাকে ফিরে যেতে হয় গ্রামে । এই শশীর গ্রাম গাওদিয়ায় ফিরে আসে কুসুম , সেখানে তার সাথে দেখা হয় গ্রামের মেয়ে মতির , যার সাথে শশী ডাক্তারের সুসম্পর্ক । তারা বিয়ে করে এবং কলকাতায় ফিরে আসে । এই কলকাতা আগের কলকাতা থেকে আলাদা । দুজন ছাত্রের চোখে দেখা কলকাতা ছিল অনেক বেশি রোম্যান্টিক , কিন্তু স্বামী এবং স্ত্রীয়ের তৈরি সংসারের কলকাতা অনেক রুক্ষ , অনেক কঠিন । মতি এবং তার পরিবার যখন শশীর সাথে কলকাতা ভ্রমনে আসে তখন তাঁরা যে কলকাতা দেখে , এই কলকাতা তার থেকেও আলাদা । ছোট একটু হোটেলের ঘর , ঘরে বসে থাকা স্বামী এবং তার বন্ধুবান্ধব , তার সাথে তাসের ও জুয়ার আড্ডা দেখে মতির চোখে জল আসে । একটি শহরকে একই উপন্যাসে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন মানুষের চোখ বিশ্লেষণ করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় । এটি তার ধী শক্তি এবং তীক্ষ্ণ সুপরিকল্পিত লেখনীর পরিচায়ক । এই কলকাতায় যেমন যৌনবিলাসী নন্দলাল থাকে তার স্ত্রী বিন্দুকে নিয়ে তেমনই থাকে জয়া এবং বনবিহারী, যে বনবিহারী শিল্পী। জয়া-বনবিহারী এবং মতি-কুমুদের প্রেম ওরফে সংসার কলকাতার বুকে প্রেমের এবং অপ্রেমের এক অদ্ভুত গ্রাফিতি এঁকে যায় যেন ।

মানিক এক লেখায় লিখছেন – ‘ লিখতে শুরু করেই আমার উপন্যাস লেখার দিকে ঝোঁক পড়লো ।কয়েকটি গল্প লেখার পরেই গ্রাম্য এক ডাক্তারকে নিয়ে আরেকটি গল্প ফাঁদতে বসে কল্পনায় ভিড় করে এলো পুতুলনাচের ইতিকথার উপকরণ এবং কয়েকদিনে একটা গল্প লিখে ফেলার বদলে দীর্ঘদিন ধরে লিখলাম এই দীর্ঘ উপন্যাসটি – এ ব্যাপারের সঙ্গে সাধ করে বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ার সম্পর্ক অনেকদিন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত থেকে যায় ।’

এই উপন্যাসে কলকাতা যেমন একটি চরিত্র তেমনই আরেকটি চরিত্র হয়ে ওঠে গ্রাম গাওদিয়া। যে গ্রামে লেখক ভালোবাসা, কামনা ,আকাঙ্খা , প্রত্যাখ্যানের গল্প লিখেছেন । মতির কথা, কুসুমের এবং শশীর কথা , সেন দিদির কথা অথবা যাদব পণ্ডিতের কথা যেন প্রকৃতির ধ্বনি প্রতিধ্বনি হিসেবে বাজে , যেন তা প্রকৃতির সাথে মানুষের এক বন্ধন তৈরি করে । উপন্যাসের প্রান্তে এসে কুসুমের প্রত্যাখান শশীকে এতটাই বিচলিত করে যে সে আর কখনও ফিরে যেতে পারেনা সেই স্থানে , চোখ তুলে দেখতে চায়না সূর্যাস্ত ।

ভৌগলিক এই পটভূমিকা ছাড়াও লেখক এক সামাজিক পটভূমিকায় এই উপন্যাসের বুনন করেছেন । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছুদিন আগে এই উপন্যাস রচিত। সেই সময়ে পরাধীন ভারতবর্ষ , সেই সময়ের গ্রাম এবং শহরের আন্তঃসম্পর্ক এখনকার মতো ছিলনা । এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজের একটু রূপরেখাও এই উপন্যাসে পাওয়া যায় । কলকাতা এবং গ্রামের জীবনযাত্রা , চিন্তা এবং চিন্তার ধরন , তার তারতম্য এই উপন্যাসে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন । শহুরে সভ্য হাওয়া লেগে শশী যেমন মন থেকে সায় পায়না গ্রামে ফেরার, এই প্রবনতা ভীষণ মারাত্মক এবং উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত শশী ডাক্তারের মনে এই দ্বন্দ্ব কাজ করে গেছে । এই দ্বন্দ্ব মানুষকে তার জীবনে প্রত্যেক মুহূর্তে কিভাবে পিছনে ঠেলে দিতে পারে তা এই উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক । সেই সময়ের মানুষের মধ্যে সামাজিক ট্যাবু হিসেবে যা পরিচিত তাকেও ভেঙ্গে ফেলার সাহস করেন গ্রামের এক গৃহবধূ , তার কামনায় তার আকাঙ্খায় তার তাড়নায় । কিন্তু শশী শহরের শিক্ষিত ডাক্তার হয়েও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, যদিও উপন্যাসের প্রান্তে এসে কুসুমের হাত ধরে সে , কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে । সেই কারনে যখন উপন্যাসের প্রান্তে এসে শশী তার হাত ধরে বলে ‘আমার সাথে চলে যাবে বৌ?’ কুসুম রাজি হয়নি । সে বলেছে ‘তা যেতাম ছোটবাবু । স্পষ্ট করে ডাকা দূরে থাক, ইশারা করে ডাকলেও ছুটে যেতাম । চিরদিন কি একরকম যায়? মানুষ কি লোহার গড়া , যে চিরকাল সে একরকম থাকবে । বদলাবে না ? বলতে বসেছি যখন কড়া করেই বলি, আজ হাত ধরে টানলেও আমি যাবো না ।’ তার তীব্র ইচ্ছে ছিল একসময় , কিন্তু আজ তা নেই , তাই আজ তার কোন ইচ্ছে নেই যাওয়ার । সে যেমন তার আকাঙ্খার কথা শশীকে সরাসরি জানিয়েছে , দ্বিধাহীন ভাবে জানিয়েছে ঠিক তেমনই যখন যাওয়ার সময় তখন সে কিছুতেই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েনা , বরং সে সোজাভাবে মুখে উপর শশীকে প্রত্যাখান করে । তাই সে বলে ‘ লাল টকটকে করে তাতান লোহা ফেলে রাখলে টাও আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে

যায় । যায় না?... কাকে ডাকছেন ছোটবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে?কুসুম কি বেঁচে আছে?সে মরে গেছে।'

এভাবেই বিভিন্ন স্তরে লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসে তার চরিত্রদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেণ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজের সাথে তার সংযোগ স্থাপন করেছেন । গাওদিয়ার প্রকৃতি অথবা কলকাতার বিভিন্ন রূপে রূপদান করেছেন তার চরিত্রের রঙ্গে । একই পটভূমি বিভিন্ন বিশ্লেষণে বিভিন্নরকম হয়ে উঠেছে । এর থেকে সহজেই বোঝা যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এই উপন্যাস কেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সেরা উপন্যাস হিসেবে বিবেচিত হয় । দেশ, কাল এবং সময়ের সীমানা পেরিয়ে এই উপন্যাস আজ কালজয়ী। চরিত্রের বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ এবং তাদের মনস্তাত্ত্বিক সৃজনের আভরণে সজ্জিত এই উপন্যাস। তাই এই উপন্যাসের পটভূমি আলোচনা করতে গিয়ে দেশ, কাল, সমাজ , শ্রেণী ইত্যাদি আরও অনেক আলোচনার সুযোগ থেকে যায় ।

৮.৫ নামকরণের সার্থকতা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতুল নাচের ইতিকথা(১৯৩৬)তাঁর প্রথম পর্বের উপন্যাস। উপন্যাসটি গাওদিয়া গ্রামের কথা অর্থাৎ উপন্যাসের পটভূমি গ্রামীণ অথচ চরিত্র গুলির মধ্যে সবটাই গ্রাম্যতা আছে তা নয়। বিশেষ করে শশী ও কুসুম এর সম্পর্কের জটিলতা--- যা উপন্যাসের মূল সংকট পল্লী সমাজের পক্ষে অনেকখানি অগ্রসর।

ইতিকথা শব্দটির উপর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর বিশেষ দুর্বলতা ছিল বলে মনে হয়। কারণ একাধিক উপন্যাসে নামকরণে ইতিকথা শব্দটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়োগ করেছেন। আবার পুতুল শব্দটি জীবনের নানা অনুষঙ্গ ব্যবহারের প্রবণতা তাঁর মধ্যে লক্ষণীয়। কলকাতা একটি পুতুল নাচের প্রদর্শনী লেখক এর মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। পরবর্তীকালে বহু উপন্যাসেই রূপকের আড়ালে পুতুল শব্দটি অবলীলাক্রমে তাঁর লেখনীতে ভর করেছে। সব সময় জেতা গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত ধরা দিয়েছে তা নয় আবার এও বিস্ময়কর চিন্তার ক্ষিপ্রতা যার মধ্যে প্রবলভাবে বর্তমান তাঁর চোখে পুতুলের ব্যবহার উচ্চারণ যেমন বিভিন্ন সময় লক্ষ্য করা যায় তেমনই সহজ মনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পুতুল কে জীবনের সাযুজ্যে দেখতে পেয়েছেন। পুতুলনাচের ইতিকথার বাইরে অনেক সময় প্রতুলের উল্লেখ তেমনভাবে নেই। কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসে পুতুলের মিছিল সমারোহে বিস্তৃত। যদিও ইতিকথা নামকরণ এই

সীমাবদ্ধ রেখেছেন লেখক দুটি শব্দের সংযোজনকে ভেঙে দেখলেই ইতি অর্থে সমাপ্তি এবং কথা অর্থে কাহিনী বোঝায়। আবার ইতিকথা শব্দটি কে একত্রে ধরলে এর অর্থ দাঁড়ায় কাহিনী। উপন্যাসের নামকরণের সম্পূর্ণ অংশ ধরলেও পুতুলের কাহিনী কিন্তু সূচিত হয় না। বরণ মনুষ্য জীবনের অন্তর্গত বিচিত্র সমস্যা-সংকট বিচিত্র জীবন চর্চা সম্পর্কে ইঙ্গিত দানের মধ্যে দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন সমীক্ষার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন।

উপন্যাসের মূল সমস্যা শশী কুসুমের সম্পর্কের টানাপোড়েন। গাওদিয়া নানান সমস্যার মধ্যে মতি কুমুদ বিন্দু নন্দলালের পাশে যামিনী কবিরাজ সেন দিদি যাদব পন্ডিত পাগল দিদি এরা সকলে শশী কুসুমের জীবনবৃত্তে সঙ্গে অলক্ষ্যে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। লেখক এর উদ্দেশ্য আরম্ভ থেকেই স্পষ্ট। হারু ঘোষের শবদেহ বহনের সূত্রে পথের দিকে চোখ পড়তে বাধ্য আর সেখানেই শ্রীনাথের বাড়ির পাশ দিয়েই পাইকপাড়ার পথ যার শেষ সীমানায় হারু ঘোষের বাড়ি। পথের মনে বকুল গাছের গোড়ায় কাঁচাপাকা পাতার সঙ্গে একটি পুতুল পড়ে থাকতে দেখা যায়। শশী পুতুলটি কে চিনতে পারে। কারণ সেটি সে শ্রীনাথের মেয়েকে কিনে দিয়েছিল। আর কাহিনী শেষে দেখা যায় সে দিদির পুতুলের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। কারণ তখন সে সন্তানসম্ভবা। রূপক টি এখানে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কিন্তু সমগ্র উপন্যাসে দেখা যায় পুতুলের রূপক টি সযত্নে লালিত। উপন্যাসে দেখা যাচ্ছে সিন্ধুর পুতুল এরা সার বেঁধে ঘুমোচ্ছে শশীর খাটের তলায়। ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পূর্ণ সেই খেলাঘর। জয়ার সঙ্গে মতির কথোপকথনে পুতুলের উল্লেখ পাই। তবে কুমুদের মুখে পুতুল শব্দের ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ। বিষয়টি লেখক এর উদ্দেশ্যকেই চরিতার্থ করেছে। নতুবা গাওদিয়া স্মৃতি ভুলে যাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার সময় মতির মনে সংক্রমিত হয় নতুন জীবন এবং পুতুলের মত কুমুদের হাতে নড়াচড়া করবার প্রসঙ্গ।

জয়ার সঙ্গে কথোপকথনে কুমুদ এর উক্তি ---"স্পিড একটু কমাও জয়া।ভরকে যাবে।পুতুল তো নয়"। পুতুলের উপমা অন্বেষণে আরো দুটি ক্ষেত্র উপন্যাস থেকে আহরণ করা যায় একটি অনন্তর উক্তি--- "সংসারে মানুষ চায় এক।হয় আর।চিরকাল এমনই দেখে আসছি ডাক্তারবাবু।পুতুল বই তো নই আমরা।একজন আড়ালে বসে খেলাচ্ছে"। উপন্যাসের শেষাংশে যখন গোপাল শোনে শশী চিরকালের জন্য গাওদিয়া ছেড়ে চলে যাবে তখন গভীর রাতে অমূল্যের ঘরে ঢুকে শশীর যাওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করে। অমূল্যর ঘরে যে বিচিত্র নাটক কথোপকথন চলে তার কিছুই ক্লান্ত শশীর চেতনায় পৌঁছয় না। জীবন সম্বন্ধে যে এত

তীব্রভাবে সচেতন,--"সে হইয়া থাকে পুতুলের মত চেতনাহীন"। উপন্যাসের শুরুতে শশীর চোখে দেখা নেকরা জড়ানো পুতুল মোহজাল আকীর্ণ জীবনের প্রতীক। নানা কামনা-বাসনা সংস্কারের বেড়াজাল নিয়তির হাতে পুতুলের মত দৃশ্য জাদুকরের খেলার সামগ্রী। মানুষের জীবন চরিত্র ও তার প্রকৃতি এর সঙ্গে নিয়তিবাদ এর প্রসঙ্গটিও যুক্ত। সম্ভবত লেখকের প্রশ্ন রেখেছেন এই মোহ আবরণ ছিন্ন করার শক্তি কি মানুষের আছে? শিক্ষার কারণে সংস্কারমুক্ত শশী। অন্যদিকে গ্রামীণ ধারণায় আত্মস্থ কারোর পক্ষেই সম্পূর্ণভাবে মোহ মুক্ত হওয়া সম্ভব নয় উপন্যাসের মধ্যে এই বিষয়টিকেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন ব্যঞ্জনায় সার্থকভাবে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন।

তিনি সেই ইতিকথা শোনাতে চেয়েছেন যেখানে মানুষ পুতুলের মতো নিয়তির দ্বারা চালিত।শিক্ষা সংস্কার বাস্তব বোধ কোন কিছুরই ভিত্তিতে নিজের জোরে দাঁড়াবার শক্তি নেই। সেই কারণেই শশীকেই শেষ পর্যন্ত কুসুমকে হারাতে হয়। শশী সমস্ত উদ্যোগ সংকল্প কেন বাস্তবে রূপায়িত হতে পারেনা কোন ব্যাখ্যা তার উত্তর মেলে না। পুতুল সাদৃশ্য মানবজীবনে কি কথা শুনিয়েছেন লেখক যেখানে মানুষের কর্মশক্তি অপেক্ষা ভাগ্য যেন অধিক শক্তি সম্পন্ন। মানুষ নিয়তিকে অতিক্রম করতে পারে না বলেই নদীর মতো নিজের খুশিতে গড়া পথে জীবনের স্রোত প্রবাহিত হয় না। মানুষেরই হাতে কাটাখালে তার গতি প্রবাহিত হয় এক অজানা শক্তির অনিবার্য ইঙ্গিতে। মাধ্যাকর্ষণ এর মত যা চিরন্তন এবং অপরিবর্তনীয়। একে উপেক্ষা করা সহজ নয় বলেই যাদব পণ্ডিতের জীবনে অনিবার্য নিয়তির মতো মৃত্যু আসে তার নিজের হাত ধরেই। শশীকে হেরে যাওয়া মানুষ বলেও কেউ কেউ আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু এই পরাজয়ের জন্য সে নিজে কতটা দায়ী এ বিষয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। নিজের বিদ্যাপতির সব প্রচেষ্টা প্রয়োগ করেও মানুষের উপকার করবার বাসনা চরিতার্থতা লাভ করে না। কারণ অদৃশ্য কোন শক্তির বাধা পেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। মতি কুমুদের উপকাহিনী বিচিত্র চরিত্রের মিছিল সব মিলিয়ে উপন্যাসের কাঠামো অভিনব। তন্মধ্যে পুতুলনাচের প্রসঙ্গ সম্পৃক্ত হয়ে লৌকিক জীবনে যেন অলৌকিকের স্পর্শ সঞ্চারিত হয়। অন্যদিকে মানুষের নিজেদের মধ্যে আধিপত্য লাভের চেষ্টা প্রবাহিত হয়। শশী চায় তার নির্লিপ্ততা সত্ত্বেও কুসুমের প্রতি তার তীব্র আকর্ষনে কোন ব্যতিক্রম ঘটবে না। জয়া ভাবে যাযাবরত্ব নিয়ে কুমুদ চলবে সারা জীবন ধরে এবং জয়া তার মধ্যেও নিজের প্রতি আকর্ষণ কে জিইয়ে রাখবে। গোপাল চায় তার মনে মনে ভেবে রাখা নির্দিষ্ট ছকে পুত্র সারা জীবন চলবে। এই ভাবেই জীবনভর পুতুল খেলায়

কাটিয়ে দিতে চায় উপন্যাসের চরিত্রগুলো। কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে পুতুল হয়ে জীবন কাটানোর বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন লেখক। আর এই কারনেই উপন্যাসের ব্যঞ্জনা ধর্মী নামকরণ করা হয়েছে পুতুল নাচের ইতিকথা।

মানুষ ভাবে এক হয় অন্য চিরকাল জীবনস্রোতে এই খেলাই চলে আসছে। হারু ঘোষের ইচ্ছা সমাপ্তি ঘটে আকস্মিক বজ্রপাতে। এখান থেকে উপন্যাসের সূচনা আর সমাপ্তি তে লেখক নিজের ভাষ্যে বলেছেন নদীর মতো নিজের খুশিতে গড়া পথে কি মানুষের জীবন স্রোত বইতে পারে মানুষের হাতে কাটাখাল তার গতি এক অজানা সত্যের অনিবার্য ইঙ্গিতে চলে মাধ্যাকর্ষণ এর মত যা চিরন্তন অপরিবর্তনীয়। বিজ্ঞানমনস্ক লেখক মানিক বন্দোপাধ্যায় যিনি চিরকাল কেন নামক মানসিক রোগে ভুগেছেন তিনিও শেষ পর্যন্ত একথা স্বীকার করেছেন যে নিয়তি মানুষকে দিয়ে পুতুল খেলায়। এই ভাবেই উপন্যাসের মূল ব্যঞ্জনা হয়ে ওঠে পুতুল খেলা ও মানুষের অসহায়ত্ব। লেখক এর উদ্দেশ্য স্পষ্টই প্রকটিত। যেমন গোপাল ছক কেটে শশীর গাওছিয়ার বাইরে যাওয়ার পথ বন্ধ করতে চেয়েছে। ঘটনার পরিণতি সত্য বলে প্রমাণিত করে। এই পুতুল নাচের ইতিকথা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সফল হয়েছেন সম্পূর্ণভাবে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত জীবন দর্শন যদিও ইতিবাচকতার বিশ্বাসী কিন্তু প্রত্যেক মানুষের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তিনি সচেতন। অন্তত পুতুলনাচের ইতিকথা সম্পর্কে একথা নিশ্চিত ভাবে প্রযোজ্য শশীর চেতনায় এবং তার জীবনে নানা বিপরীতমুখী টানাপোড়েন এ রচিত হয়েছে মানুষের মানবিক সম্পর্কের আদি মধ্য অন্ত সমন্বিত নিয়তি শাসিত জীবনের ইতিহাস। এই কারণেই উপন্যাসের নামকরণ যথার্থ ও সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

৮.৬ শশী-কুসুম প্রসঙ্গ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শশী । উপন্যাসের একদম গোড়ায় তার সাথে দেখা হয় হারু ঘোষের । কিন্তু হারু জীবিত নয় , বজ্রাঘাতে তার মৃত্যু হয়েছে । এভাবে হারু ঘোষের প্রসঙ্গে প্রথম উন্মোচিত হয় গল্পের নায়কের পর্দা , শশীকে চিনতে শুরু করে পাঠক ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার পুতুল নাচের ইতিকথা উপন্যাসে কুসুম চরিত্রের অঙ্কন করেছেন এক জটিল এবং অতলান্তিক গভীরতার মধ্য দিয়ে । কুসুম এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র এবং

শশী ডাক্তারের সাথে তার সম্পর্কের অদ্ভুত উত্থান এবং পতন এই গোটা উপন্যাস জুড়ে পাঠকের মনস্তত্বে এক গভীর প্রভাব রেখে যেতে সমর্থ হয় ।

এই উপন্যাসে কুসুমের আবির্ভাব ভীষণ অনাড়ম্বর ভাবে , শশী ডাক্তার পরাণের বাড়িতে যায় মতিকে পরীক্ষা করতে, সেই সময়ে লেখক লিখছেন – 'কুসুম গিয়াছিল ঘাটে' । সেই প্রথম উপন্যাসে কুমুমের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এটি। কুসুম এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র হলেও তার পরে গোটা সময় জুড়ে কুসুমের যে গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ চলবে তার কোনো আভাস উনি দেননি শুরুতে । ভীষণ নির্লিপ্তভাবে কুসুমের উপস্থিতি বর্ণনা করেন লেখক ।

কুসুমের এই নির্লিপ্ত স্বভাব আমরা গোটা উপন্যাসেই দেখতে পাই । সে অনায়াসে শশী ডাক্তারের সখের গোলাপ চারা পায়ে মাড়িয়ে দিতে পারে বার বার । সে কোন অছিলায় কাছে আসতে পারে শশীর । কুসুমের কোন ভান নেই, কোন অবরন নেই । এহেন আবরণহীনা কুসুম প্রথম থেকেই বিভিন্নভাবে শশীকে জানিয়েছে তার মনে কথা । কখনও মতির নামে মিথ্যে কথা বলে সে শশীর সাথে কথা বলতে চেয়েছে কিছু বেশী । কখনও সে কুমুদকে বলেছে ' ছোটবাবু আমাদের বলতে গেলে একরকম আপনার লোক, দুবেলা আসেন ।' কখনও আবার কুসুম শশীকে চরম অপমান করে ।

শশী এবং কুসুমের এই সম্পর্ক নানা দ্বিধা এবং দ্বন্দ্বের জটিলতায় পরিপূর্ণ । কুসুম কখনও নিজ কামনায় আকুল হয়ে আছড়ে পড়ে , আবার শশী কখনও সমাজ এবং নিজ মনস্তাত্ত্বিক দ্বিধার শঙ্কায় জীর্ণ ।

কুসুমের চরিত্রের অন্যতম প্রধান দিক হল তার স্পষ্ট ভাষা । সে শশীর বাড়ি যায় পেটে ব্যাথার মিথ্যে অজুহাতে এবং গিয়ে শশীর সাথে গোলাপ চারা মাড়িয়ে দিয়ে তার সহজাত নির্লিপ্ত বদনে বলে 'ইচ্ছে করেই দিয়েছি ছোটবাবু । চারার জন্য এত মায়া কেন?' শশীর ভালোবাসার চারাগাছ মাড়িয়ে সে প্রমাণ করতে চায় যে ওই গোলাপচারার মধ্যে শশী কি এমন দেখতে পায় যা কুসুমের মধ্যে নেই? যে ভালোবাসা শশী ওই গোলাপচারাকে দেয় সেই ভালোবাসা আসলে তো কুসুমেরই প্রাপ্য । এই স্পষ্ট কথা কুসুম ব্যাক্ত করে তার এই ছোট কাজের মধ্য দিয়ে ।

কুসুম যেহেতু পরাণের সঙ্গে বিবাহ সুত্রে আবদ্ধ সেই কারনে পরাণের চরিত্রও সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে । পরাণের প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন- 'পরাণ সব বিষয়ে উদাসীন । সন্ধ্যার আবির্ভাবে তাহার বোন আর বৌ যত ব্যাস্ত হইয়া ওঠে, সে যেন ততই ঝিমাইয়া যায় । রান্নাঘরে বসিয়া কুসুমের সঙ্গে সে প্রথম একটু গল্প জমাইবার চেষ্টা করিয়াছিল । গল্প করিবার সময় না থাকায় কুসুম তাহাকে আমল দেয় নাই; দাওয়ায় বসে হুঁকা টানগে না বাপু? মেয়ে-মানুষের আঁচল ধরা পুরুষকে আমি দুচোখে দেখতে পাড়ি না ।- কুসুমের ভর্ৎসনায় চিরকাল পরাণের খারাপ লাগে। তবে স্পষ্ট খারাপ লাগার ভাবতা এত অল্প সময়ের মধ্যে মনের একটা উদাস বৈরাগ্য ও দেহের একটা ঝিমানো আলস্যে পরিণত হইয়া যায় যে, রাগিবার অবসর প্রায়ই সে পায় না ।' পরাণের সাথে তার স্ত্রী কুসুমের মনের বিস্তর ফারাক । এই ফারাকের পরিখা পেরিয়ে কিছুতেই ঝাঁঝালো কুসুমের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না পরাণের উদাস এবং আলস্যে ভরা মন । তাই কুসুমের অন্তর রয়ে যায় অন্তর্নিহিত এবং সম্পর্ক থেকে যায় শুধুমাত্র সামাজিক পরিচয়ে ।

কুসুমের এই মনোবৃত্তি জটিল এবং গভীর । কুসুম তার যুবতী শরীর বিষয়ে সচেতন এবং এই বিষয়ে সে মতিকেও ঈর্ষা করে । যাত্রাপালা দেখতে যাওয়ার আগের মুহূর্তে 'মতির হাল্কা অপরিণত দেহটিকে কুসুম হিংসা করে । মনে হয় তাহার নিজের স্বাস্থ্য এতখানি ভালো না হইলেই যেন সে খুশি হইত' মতিকে সে ঈর্ষা করতে থাকে কারন শশী ডাক্তার মতিকে ভালোভাবে পরীক্ষা করলেও তাকে পরীক্ষা করেনা । 'কানে নল লাগাইয়া শশী মতির বুকটা পরীক্ষা করিয়া দেখিল, নিঃশব্দ পদে কুসুম পেছনে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে, বুকে ওর হয়েছে কি? অত পরীক্ষে কিসের?' কুসুম নিজের পেটে ব্যাথার অছিলায় শশী ডাক্তারকে বাড়িতে ডেকে আনে এবং ডেকে এনে তাকে পরীক্ষা করতে বলে । কুসুম বলে তার পেটে ব্যাথা হয়েছে। মাঝরাতে বিরক্ত হয় শশী , সে বলে 'পেটের ব্যাথাটা বড় রহস্যময় অসুখ' কিন্তু তবু কুসুম মিথ্যে বলে শশীকে , সে বলে সে ওষুধ খেয়েছে তবু তার ব্যাথা কমেনি । এই কথা শুনে শশী বলে এটি সে বাড়াবাড়ি করছে । কুসুম বলে 'কী আছে? বাড়াবাড়ি? হ্যাঁগো ছোটবাবু , আছেই তো । তা যাই বলেন। এক ঘণ্টা ধরে বুক পরীক্ষা ম্যালেরিয়া জ্বর হলে, আমি করি না' এই কোথায় শশী বিব্রত হয়, কুসুম তাই চায় , সে চায় নানা অছিলায় শশীকে বিব্রত করতে এবং সে কথার মাঝে শশীকে অপমান করতে ছাড়ে না।

একদিকে যেমন কুসুম বিব্রত করে তোলে শশীকে অপরদিকে দুজনেই দুজনের প্রতি উদ্বিগ্ন । এ কথা বুঝতে পারা যায় বিভিন্ন ঘটনায় । শশী আসে কুসুমের জিভ পরীক্ষা করতে এবং সে কুসুমের জিভ দেখে ' না জিভ অপরিষ্কার থাকার কোন কারন নাই । কুসুমের স্বাস্থ্য বাহিরের ফাঁকি নয়, ভিতরেও সে খুব মজবুত । কুসুমকে শশীর এইজন্যই ভালো লাগে।'

এই কোথায় যেমন বোঝা যায় শশী ডাক্তার কুসুমের প্রতি উদ্বিগ্ন ঠিক তেমনই আরেকটি ঘটনায় এই একই মানসিক প্রবৃত্তি ফুটে ওঠে কুসুমের থেকে । যাদব পণ্ডিতকে নিয়ে শশী যখন খানিক বিব্রত তখন কুসুম এসে জানতে চায় তার এমন মুখের কারন কি । সে বলে তার মুখ কেন এত শুকনো লাগছে, কথার উত্তরে বিরক্তি প্রকাশ করে শশী জানায় তার মন ভালো নেই এবং এর থেকে বেশী কৈফিয়ত সে তাকে দিতে পারবেনা । এই কথায় রুষ্ট হয়ে কুসুম বলে 'কৈফিয়ত কেউ চায়নি আপনার কাছে। মুখ শুকনো দেখে মায়া হল, তাই জানতে এলাম অসুখ - বিসুখ হয়েছে নাকি । সংসারে জানেন ছোটোবাবু, যেচে মায়া করতে গেলে পদে পদে অপমান হতে হয় ।'

এই কোথায় কুসুমের শশীর প্রতি অভিমান ফুটে ওঠে । এর থেকে আরেকটি বিষয়ও বোঝা যায় সে সে শশীর প্রতি যতটা যত্নশীল, তা সে পরাণের প্রতি নয় । কারন পরাণের সাথে তার এই ধরনের কোন কথোপকথন পাঠক দেখতে পাননা এই উপন্যাসে ।

শশী এবং কুসুমের ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই বয়ারতে থাকে এবং তা শশীর চিন্তার কারন হয়ে দাঁড়ায়। আগেই বোঝা গেছে কুসুম যেমন সহজ এবং সাবলীল এই প্রকাশের বিষয়ে শশী তা নয় । তাই শশী বলে 'আমরা ছেলেমানুষ নই, ইচ্ছে হলেই একটা কাজ কি আমরা করতে পারি? বুঝেসুঝে কাজ করা দরকার । একে তো দ্যাখো পরান আমার বন্ধু, উপকার করতে গিয়ে চিরকাল ওর অপকারই করেছি ।' এই কোথায় শশীর কুসুমের প্রতি এবং সর্বোপরি তার সংসারের প্রতি এক গভীর উদ্বেগ পরিলক্ষিত হয় ।

যখন কুসুম বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার জন্য রওনা দিলে শশী বাজিতপুর যাবে বলে আসে এবং তার সাথে দেখা হয় । কুসুম ভীষণ সন্তর্পণে একবার তার বাপের দিকে তাকিয়ে নেয় এবং শশীকে জিজ্ঞাসা করে 'আমার জন্য এলেন আজ' , শশী তার উত্তরে হ্যাঁ বলেন এবং এতে কুসুমের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । এই উজ্জলতাই হয়তো শশী এবং কুসুমের অন্তরের প্রেমের আখ্যান সঠিকভাবে বর্ণনা করতে পারে ।

মন্তব্য

অনেক দিন পড়ে যখন অনেক সময় কেটে গেছে এবং শশী ক্রমাগত দূরে সরিয়ে গেছে কুসুমকে , এক সময়ে এসে শশী নিজের কাছে হেরে যায় এবং একা হয়ে পড়ে ।

শশী তার হাত ধরে বলে 'আমার সাথে চলে যাবে বৌ?' কুসুম রাজি হয়নি । সে বলেছে 'তা যেতাম ছোটবাবু । স্পষ্ট করে ডাকা দূরে থাক, ইশারা করে ডাকলেও ছুটে যেতাম । চিরদিন কি একরকম যায়? মানুষ কি লোহার গড়া , যে চিরকাল সে একরকম থাকবে । বদলাবে না? বলতে বসেছি যখন কড়া করেই বলি, আজ হাত ধরে টানলেও আমি যাবো না ।' তার তীব্র ইচ্ছে ছিল একসময় , কিন্তু আজ তা নেই , তাই আজ তার কোন ইচ্ছে নেই যাওয়ার । সে যেমন তার আকাঙ্খার কথা শশীকে সরাসরি জানিয়েছে , দ্বিধাহীন ভাবে জানিয়েছে ঠিক তেমনই জখন যাওয়ার সময় তখন সে কিছুতেই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েনা , বরং সে সোজাভাবে মুখে উপর শশীকে প্রত্যাখান করে । তাই সে বলে ' লাল টকটকে করে তাতান লোহা ফেলে রাখলে টাও আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে যায় । যায় না?... কাকে ডাকছেন ছোটবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে?কুসুম কি বেঁচে আছে?সে মরে গেছে ।'

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১. পুতুল নাচের ইতিকথা কবে কোথায় প্রকাশিত হয়?

উত্তর-১৩৪১ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা থেকে ১৩৪২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা পর্যন্ত "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় 'পুতুল নাচের ইতিকথা' প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। এটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় উপন্যাস এবং চতুর্থ প্রকাশিত গ্রন্থ।

২. উপন্যাসের শেষে কুসুম শশীর সঙ্গে যেতে না চেয়ে কি বলেছে?

উত্তর-"লাল টকটকে করে তাতানো লোহা ফেলে রাখলে তাও আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়েযায়। যায় না?... কাকে ডাকছেন ছোটবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে? কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মরে গেছে।"

৮.৭ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পুতুল নাচের ইতিকথা উপন্যাসের পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা করো।

২. পুতুল নাচের ইতিকথা উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

৩. পুতুল নাচের ইতিকথা উপন্যাসে শশীও কুসুম এর বৃত্তান্ত লেখ।

৪. পুতুল নাচের ইতিকথা উপন্যাসের গঠন শৈলী বর্ণনা করো।

৮.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়- নিতাই বসু

২. বক্তব্য- ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

৩. নিয়তিবাদ উদ্ভব ও বিকাশ- সুকুমারী ভট্টাচার্য।

একক ৯ পুতুল নাচের ইতিকথা- চরিত্র চিত্রণ

বিন্যাসক্রম

৯.১ শশী

৯.২ কুসুম

৯.৩ মতি

৯.৪ কুমুদ

৯.৫ যাদব

৯.৬ গোপাল

৯.৭ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

৯.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৯.১ চরিত্র – শশী

শশী ডাক্তারের চরিত্রটি এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুতুল নাচের ইতিকথা উপন্যাসে শশী ডাক্তারের চরিত্র এমনভাবে গড়েছেন যা শুধুমাত্র তাঁর উপন্যাসের নয়, গোটা বাংলা সাহিত্যের এক অন্যতম সেরা এবং জটিল চরিত্র হিসেবে নিজ আলোকে উজ্জ্বল ।

শশী চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক সেই সময় অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধর প্রাক্কালে বাঙালির মনন, চেতনা এবং ব্যাক্তিতের দ্বন্দগুলি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন । এই উপন্যাসে শশী ডাক্তার গাওদিয়া গ্রামের বাসিন্দা এবং গ্রাম্য চিন্তাধারা এবং মনন দ্বারা প্রায় সম্পৃক্ত । লেখক উপন্যাসের একেবারে গোড়াতেই শশীর পরিচয়

দিতে গিয়ে বলেন এই কথা । ছোট থেকে শশীর সাথে গ্রামের অন্য মানুষদের অন্তঃসম্পর্ক এবং তাঁর বড় হয়ে ওঠার সময়ে তাদের ভুমিকা লেখক বর্ণনা করেছেন এই উপন্যাসে । গাওদিয়া ছেড়ে শশীকে ডাক্তারি পড়তে শহরে যেতেই হয়, এবং সেখানে গিয়ে তাঁর ছোট থেকে দেখে আসা গ্রাম্য জীবন, সংকীর্ণ মনভাব পাল্টাতে থাকে। এই শহরের জীবনপর্যায়ে লেখক কুমুদ নামের একটি চরিত্রের আবির্ভাব হয় । কুমুদের মাধ্যমে শশীর পরিচয় ঘটে থিয়েটার , কবিতা, বিশ্ব সাহিত্যের সাথে । লেখক এই অংশে শশীর গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাঁর পরিবর্তনের একটি বিস্তৃত রূপরেখা অঙ্কন করেছেন যা পরবর্তীতে শশীর জীবন এবং ততসহ গাওদিয়ার মানুষদের সাথে শশীর সম্পর্ক নির্মাণ এবং বিনির্মাণ অনুধাবন করতে সাহায্য করবে ।

শশীর মনে এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব নির্মাণ করেছেন লেখক । যা শশীকে গাওদিয়ার মানুষ থেকে ক্রমে আলাদা করে। যা শশীকে শেষমেশ করে দেয় একা । এই দ্বন্দে থেকেই শশী ডাক্তার পরাজিত এবং একাকী নিঃসঙ্গ এক মানুষে পরিবর্তিত হয় ।

শশীর চরিত্রে দুটি সুস্পষ্ট ভাগ করেছেন লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় । একদিকে যেমন সে কল্পনাপ্রবণ, রসিক অন্যদিকে তার সংসারের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং বিষয় সম্পত্তির প্রতি খেয়ালও বর্তমান । একদিকে যেমন কলকাতায় থেকে সে মুক্ত বিশ্বের রস আস্বাদন করেছে, অন্যদিকে সে গাওদিয়ার বাসিন্দা । সর্বক্ষণ শশীর সাথে এই দ্বন্দ থেকেছে । যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তার দুটি সত্তা নিজেদের মত প্রকাশ করেছে অচিরেই । কিন্তু লেখক নিজের বর্ণনায় বলেছেন – ‘তাহার কল্পনাময় অংশটুকু গোপন ও মূক । অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে তাহার সঙ্গে না মিশিলে একথা কেহ টের পাইবে না যে , তার ভিতরেও জীবনের সৌন্দর্য ও শ্রীহীনতার একটি গভীর সহানুভূতিমূলক বিচার পদ্ধতি আছে ।’

কলকাতায় ডাক্তারি পড়ার সময় তার জীবনে যে পরিবর্তন আসে বন্ধু কুমুদের সঙ্গে থেকে , সেই প্রসঙ্গে লেখক বলছেন – ‘কলকাতায় থাকিবার সময় তাহার অনুভুতির মার্জনা আনিয়া দেয় বই এবং বন্ধু ...যে দুর্গের মধ্যে গোপাল তাকে পুরিয়া সিল করিয়া

দিয়াছিল । কুমুদ তাহা একেবারে ভাঙ্গিতে পারিল না বতে কিন্তু অনেকগুলি দরজা জানালা কাটিয়া বাহিরের আলো বাতাস আনিয়া দিল ।'

গ্রামে ফিরে এসে শহরের এই প্রভাব শশীর মনে সুস্পষ্ট কিন্তু তাহলেও সে গ্রামের ছোটবেলা থেকে দেখে আসা জীবনচর্চার থেকে নিজেকে একেবারে আলাদা করতে পারেনা । গ্রামের অন্যতম ধুরন্ধর লক গোপালের ছেলে সে । বিভিন্ন ঘটনায়, তার পিতার প্রভাব তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয় । বাড়ুজ্জেদের সাথে ওষুধ এবং ভিজিটের টাকা নিয়ে তার যে মনোভাব পরিলক্ষিত হয় তা কলকাতায় পড়ে ফেরা সেই শশীর নয় , তা গাওদিয়ার গোপালের পুত্র শশীর , যা শশীর দ্বৈত মনোভাব স্পষ্ট করে দেয়।

শশীর দ্বৈত চরিত্র বোঝাতে গিয়ে লেখক এই উপন্যাসে শশীর জীবনের এমন একটি দিক বর্ণনা করেছেন যা আপাতভাবে প্রকট না হলেও, প্রচ্ছন্ন অবস্থাতেই তা শশীর জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে । শশী ডাক্তারি পড়তে কলকাতা যায় এবং সেই শহরের আদব কায়দা সে শিখতে থাকে । তবে শুধুমাত্র আদব কায়দা নয়, তার সাথে সাথে গ্রামের জীবনে অভ্যস্ত যুবক শশীর সামনে যেন এক নতুন জানালা খুলে যায় । সেই হাওয়া তার মননের গভীরে প্রবেশ করে , এতই গভীরে যে সহজে তা দেখা যায়না কিন্তু শশীর জীবনে তার ভীষণ প্রভাব পড়তে থাকে । এতদিন যে গ্রামে সে মানুষ হয়েছে সেই গ্রামে ফিরে যেতে তার দ্বিধা বোধ হয় । তার ছোটবেলার গ্রাম তার কাছে পরবাস মনে হতে শুরু করে । শহুরে সভ্যতার অভাবে তার গ্রামের কাদামাখা মেঠো পথ বেশিই অন্ধকার মনে হয় । উপন্যাসের বিভিন্ন অংশে শশী বলে যে যে এই গ্রামের থেকে চলে যেতে চায় । যে যেতে চায় বিলেতে, সেখানে গিয়ে সে আরও বড় ডাক্তার হতে চায় , ফিরে এসে শহরে পসার জমাতে চায় , প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে চায় । এই সকল অংশে শশীর চরিত্রের মধ্যে তার বাবা গোপালের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । সে স্বপ্ন থেকে তার ভালোবাসার মানুষের , লেখক লিখেছেন – 'একদিন কেয়ারী করা ফুলবাগানের মাঝখানে বসানো লাল টাইলের ছাওয়া বাংলোয় শশী খাঁচার মধ্যে কোনারি পাখির নাচ দেখিবে, দামী ব্লাইজে ঢাকা বুকখানা শশীর বুকের কাছে স্পন্দিত হইবে,-আলো হাসি গান আনন্দ আভিজাত্য- কিসের অভাব তখন থাকিবে শশীর?'

এই দুয়ের দ্বন্দে ধীরে ধীরে শশী নাজেহাল হয়ে পড়ে , বিভিন্ন সময়ে নিজের কথাকে সে নিজে বিশ্বাস করতে পারে না । নিজের সিদ্ধান্তকে নিজেই সন্দেহ করে এবং তার চারপাশের মানুষজনকে একে একে হারাতে থাকে । সেন দিদি, পাগলদিদি, যাদব পণ্ডিত, যামিনী কবিরাজের মৃত্যু হয় তার চোখের সামনে । সেন দিদির সাথে তার সম্পর্কের গভীরতা লেখক নিপুনভাবে অঙ্কন করেছেন উপন্যাসে । এছাড়াও বাকি সকলে তার খুব কাছের লোক ছিলেন, সকলের সাথে মতের মিল না হলেও কাউকে শশী অস্বীকার করতে পারেনা । এদের মৃত্যু যেমন শশীকে একা করে দেয় ঠিক তেমনই কুসুম, গোপাল এবং পরানের গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়া শশীর জীবনকে এক বন্ধ গলির সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় । শশী কোথাও যেতে পারেনা এবং তাকে গ্রামেই থেকে যেতে হয় । সে এই গ্রামে থাকে এবং তার মনে হয় সে এখানে আটকে পরেছে। লেখক বর্ণনা করেন – 'শশীর মনে হয় চিরকালের জন্য সে মার্কামারা ডাক্তার হইয়া গিয়াছে – এই গ্রাম ছাড়িয়া কোথাও যাইবার শক্তি নাই ।'

কুসুমের সাথে শশীর যে সম্পর্ক এই উপন্যাসে বর্ণিত , তাতেও শশীর চরিত্রের দ্বৈত ভাব লক্ষ্য করা যায় । কুসুম শশীর বন্ধু পরানের স্ত্রী এবং শশীর সাথে পরানের পরিবারের সম্পর্ক আত্মীয়তার । শশী কলকাতা থেকে ফিরে এসে তার আধা গ্রাম্য এবং আধা শহুরে মন নিয়েও কুসুমের ভালোবাসার ডাকে সাড়া দিতে দ্বিধা বোধ করে। নিজের মনোস্তত্বে যে মানবীর ছবি শশী কল্পনা করেছে সে এই গ্রামের পুকুরের পাশে তালবনে দাঁড়ানো কুসুম নয় । তার রুপ এর থেকে অনেক আলাদা, অনেক পরিশীলিত । অন্যদিকে কুসুমের ভালোবাসার প্রকাশ অনাড়ম্বর , আভরণহীন । কুসুম গ্রামের মেয়ে এবং পরাণের স্ত্রী । সেই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে এসে কুমুম যখন শশীকে বলে তার ভাষায় – ' কুসুম নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু ?'

তার উত্তরে শশী বলে – 'শরীর! শরীর! তোমার মন নাই কুসুম ?'

৯.২ চরিত্র – কুসুম

বাংলা সাহিত্যে নারীচরিত্র সর্বদা গভীর এবং জটিল মনস্তাত্ত্বিক রুপে অঙ্কিত হয়েছে । শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য সাহিত্যিকদের লেখায় বিভিন্ন নারীচরিত্রদের উপস্থিতি আমরা দেখতে পাই যা গভীর এবং জটিল মনস্তত্তের পরিচায়ক । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার পুতুল নাচের ইতিকথা উপন্যাসে কুসুম চরিত্রের অঙ্কন করেছেন এক জটিল এবং অতলান্তিক গভীরতার মধ্য দিয়ে । কুসুম এই উপ্ন্যাসীক প্রধান চরিত্র এবং শশী ডাক্তারের সাথে তার সম্পর্কের অদ্ভুত উত্থান এবং পতন এই গোটা উপন্যাস জুড়ে পাঠকের মনস্তত্তে এক গভীর প্রভাব রেখে যেতে সমর্থ হয় ।

এই উপন্যাসে কুসুমের আবির্ভাব ভীষণ অনাড়ম্বর ভাবে , শশী ডাক্তার পরাণের বাড়িতে যায় মতিকে পরীক্ষা করতে, সেই সময়ে লেখক লিখছেন – ‘কুসুম গিয়াছিল ঘাটে’ । সেই প্রথম উপন্যাসে কুমুমের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এটি । কুসুম এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র হলেও তার পরে গোটা সময় জুড়ে কুসুমের যে গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ চলবে তার কোনো আভাস উনি দেননি শুরুতে । ভীষণ নিরলিপ্তভাবে কুসুমের উপস্থিতি বর্ণনা করেন লেখক । এই নিরলিপ্ততার মধ্য দিয়ে আসন্ন খেলার কোন আভাস তিনি দেন না ।

কুসুমের চরিত্রের দ্বন্দ্ব তখন থেকেই শুরু হয় যখন কুসুম মতির শরীর সম্বন্ধে মিথ্যে বলতে থাকে শশী ডাক্তারকে । সে মতিকে এক রকম কথা বলে আবার মতির বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্য কথা বলে শশী ডাক্তারকে । সে বলে- ‘রোজ একবার এলেই হয়? জ্বরে ভুগছে মেয়েটা, দেখে তো যাওয়া উচিত? কদিন আসেননি বলে বাড়ির সবাই কত কথা বললে ছতবাবু । বললে শশী আমাদের মস্ত ডাক্তার হয়েছে , না ডাকলে আর আসা হয়না । মতি কি বললে জানেন? – ছোটবাবুর অহঙ্কার হয়েছে ।’ কুসুম এভাবেই অনায়াসে সাজিয়ে গুছিয়ে বানিয়ে কথা বলে , কোথাও তার এতটুকুও দ্বিধা কাজ করেনা । সে এমনই নির্লিপ্ত , কিন্তু তার মধ্যে যে চাওয়া রয়েছে, যে কামনা রয়েছে তা

সেই নির্লিপ্ত স্বভাবের মধ্য দ্যেও ফুটে ওঠে , তা পাঠক যেমন বুঝতে পারেন, তেমন বুঝতে পারে শশী ডাক্তার । 'তাই শশী আগাইয়া যায়, বলে আমার কাজ আছে বৌ । কাল এসে তোমার মিথ্যে কথা শুনবো ।'

কুসুমের চরিত্রের অন্যতম প্রধান দিক হল তার স্পষ্ট ভাষা । সে শশীর বাড়ি যায় পেটে ব্যাথার মিথ্যে অজুহাতে এবং গিয়ে শশীর সাথে গোলাপ চারা মাড়িয়ে দিয়ে তার সহজাত নির্লিপ্ত বদনে বলে 'ইচ্ছে করেই দিয়েছি ছোটবাবু । চারার জন্য এত মায়া কেন?' শশীর ভালোবাসার চারাগাছ মাড়িয়ে সে প্রমাণ করতে চায় যে ওই গোলাপচারার মধ্যে শশী কি এমন দেখতে পায় যা কুসুমের মধ্যে নেই? যে ভালোবাসা শশী ওই গোলাপচারাকে দেয় সেই ভালোবাসা আসলে তো কুসুমেরই প্রাপ্য । এই স্পষ্ট কথা কুসুম ব্যাক্ত করে তার এই ছোট কাজের মধ্য দিয়ে । এইভাবেই কুসুম বার বার কামনার জ্বালায় এসেছে শশীর দরজায় , গ্রাম্য সমাজের সব সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূর করে সে এসেছে শশীর কাছে । সে শশীর ঘরে গেছে কিন্তু শশী তাকে প্রতাখ্যান করেছে বারম্বার । শশীর কাছে সে পেয়েছে শুধু ফিরে যাওয়া । সেই কারনে যখন উপন্যাসের প্রান্তে এসে শশী তার হাত ধরে বলে 'আমার সাথে চলে যাবে বৌ?' কুসুম রাজি হয়নি । সে বলেছে 'তা যেতাম ছোটবাবু । স্পষ্ট করে ডাকা দূরে থাক, ইশারা করে ডাকলেও ছুটে যেতাম । চিরদিন কি একরকম যায়? মানুষ কি লোহার গড়া , যে চিরকাল সে একরকম থাকবে । বদলাবে না ? বলতে বসেছি যখন কড়া করেই বলি, আজ হাত ধরে টানলেও আমি যাবো না ।' তার তীব্র ইচ্ছে ছিল একসময় , কিন্তু আজ তা নেই , তাই আজ তার কোন ইচ্ছে নেই যাওয়ার । সে যেমন তার আকাঙ্খার কথা শশীকে সরাসরি জানিয়েছে , দ্বিধাহীন ভাবে জানিয়েছে ঠিক তেমনই জকজন যাওয়ার সময় তখন সে কিছুতেই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েনা , বরং সে সোজাভাবে মুখে উপর শশীকে প্রত্যাখান করে । তাই সে বলে ' লাল টকটকে করে তাতান লোহা ফেলে রাখলে টাও আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে যায় । যায় না?... কাকে ডাকছেন ছোটবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে?কুসুম কি বেঁচে আছে?সে মরে গেছে ।'

‘ কুসুম নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু ?’ শশী বলে ‘ শরীর! শরীর! তোমার মন নাই কুসুম?’

সেই কুসুম যখন এইভাবে শশীকে প্রত্যখান করে তখন আর কোন জবাব থাকেনা শশীর কাছে । সে এত মৃত্যু দেখেছে তার চারিপাশে, যে মানুশগুলো তাকে ছেড়ে চলে যায় তারাও তো মৃত তার কাছে । গোপাল, তার বাবা চলে যায় । পরে কুসুমও চলে যায় , এবং সে বলে যায় যে তার এই চলে যাওয়া তার মৃত্যুর সমান ।

৯.৩ চরিত্র – মতি

পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসে শশী এবং কুসুমের অংশ যদিওবা বেশিরভাগ , তবু তার পরেই যার কথা আসে তার নাম মতি । মতি পরাণের বোন এবং এই উপন্যাসের সুত্রপাত তাকে দিয়েই, তার পিতা অর্থাৎ হারু ঘোষের মৃত্যুই এই উপন্যাসের সুত্রপাত করে । মতি বিবাহযোগ্যা এবং তার পিতা তার জন্য ভিন গাঁয়ে পাত্র দেখে বেড়ান, এমনই এক দিন ভিন গাঁয়ে পাত্র দেখতে গিয়ে গাছের তলায় বিদ্যুৎ পিষ্ট হন হারু ঘোষ ।

মতির চেহারার বিশেষ উল্লেখ এই উপন্যাসে করেছেন লেখক । তিনি লিখেছেম ‘ রসালো ফলের মতো কোমল রং যে মতির, প্রতিমার মতো অমন নিখুঁত মুখ’ এই সব সত্তেও মতি অপরিচ্ছন্ন থাকে, শশী তার চিকিৎসা করতে এসে সাবান না মাখা নিয়ে তাকে বলে । শশীর দ্বিধাগ্রস্ত মন কখনই স্থির করতে পারেনা কিছুতে । তাই মতির প্রতি তার দুর্বলতাও বোঝা যায়না সহজে । মতি তাল পুকুরের নির্জন প্রান্তে বসে তার সুখী সংসারের স্বপ্ন দেখে – ‘মতির ভারী ইচ্ছা, বড়লোকের বাড়িতে শশীর মত বরের সঙ্গে তার বিবাহ হয় । কাজ নাই, বকুনি নাই, কলহ নাই, নংরামি নাই, বাড়ির সকলে সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে । মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে হাসে, তাসপাশা খেলে,কলের গান বাজায় আর – বাড়ির বৌকে খালি আদর করে ।’ মতি এই সব স্বপ্ন দেখে প্রাথমিকভাবে শশীর কথা মাথায় রেখে । মতির মনে এই স্বপ্নের সঞ্চার করে তার

বাবা হারি ঘোষ , যখন সে মতির জন্য ভালো পাত্র খুজতে বাইরের গ্রামে গ্রামে ঘুরতে থাকে । তখন থেকেই মতির স্বপ্নের মধ্যে আকাঙ্খা বারতে থাকে ।

শশী পারেনা মতির সে স্বপ্ন পূর্ণ করে তুলতে । শশী শহুরে এবং দ্বিধাগ্রস্ত । শশীর এই দ্বন্দ্ব শশীকে কোন অবস্থানেই স্থির হয়ে থাকতে দেয়না । শশীর শহরের বন্ধু কুমুদ আসে যাত্রাপালায় অভিনয় করতে । তার সঙ্গে মতির যোগাযোগ হয় এবং দুজনের মধ্যে এক গভীর প্রনয়ের সুত্রপাত হয় । কুমুদ যদিও শহুরে আদব কায়দায় অভ্যস্ত তবুও তার কোমল হৃদয়ে সে বেধে ফেলে মতিকে।

কুমুদ যাত্রাপালায় অভিনয় করতে গ্রামে আসে এবং শশীর বাড়িতে এসে থাকে । এই সময় তালপুকুরের ধারে সে যায় এবং রবারের একটি জিনিস তার পায়ে ঠেকে, সে তাকিয়ে দেখে সেটি একটি সাপ এবং সেই সাপ তার পায়ে হাঁটুর কাছে কামড়েছে । সুধু কামড়ায়নি বরং তার লেজের পিছন দিয়ে তার পা জড়িয়ে ধরে আছে । এই দৃশ্য দেখে কুমুদ যারপরনাই ভয় পেয়ে যায় এবং তার ধারনা হয় যে সাপটি বিশাক্ত এবং এই সাপের বিষ তার প্রাণ নিয়ে নেবে । ঠিক এমন সময় আতঙ্কগ্রস্ত কুমুদের সামনে এসে উপস্থিত হন মতি । মতি কুমুদকে বলে যে এই সাপ বিশাক্ত নয় এবং এটি তার প্রাণ নেবেনা । এই সাপের বিষ নেই । এই কথা শুনে কুমুদ আস্বস্ত হয় এবং দেহে প্রাণ ফিরে পায় । কুমুদের সাথে মতির এই বন্ধন যেন চিরতরের । যে কুমুদ কোনদিন এক জায়গায় থিতু হয়নি, বরাবর জাজাবরের মত জীবন কাতিয়েছে তার সামনে কি এমন হলো যে সে তার বোহেমিয়ান ছেড়ে দিয়ে সংসার করার কথা চিন্তা করতে লাগলো । জয়া নামের যে মহীয়সী নারী, যে কখন কুমুদের মন হয় করতে পারেনি , কুমুদ কখনও তার মনের জানালা কুলে দেয়নি, কুমুদ কি জানতো এই গ্রাম্য পরিবেশে, এই গাওদিয়ায় এসে তার জানালা খুলতে মতি আসবে ? হয়তো কেউই জানতো না । মতির কাছে এ ভীষণ আশ্চর্যের সময়। যা সে চিরকাল চেয়ে এসেছে , যা সে চেয়েছে শশী ডাক্তারের কাছে, যা সে পায়নি , আচমকাই কোন পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই তা মতির সামনে উপস্থিত । মতি মোহিত হয়ে যায় কুমুদের সামনে । যাত্রাপালা দেখতে যাওয়ার জন্য তার অসীম আগ্রহ তৈরি হয় । যাত্রার আসরে এসে

মতি দেখে প্রচুর আলো, এত আলো সে আগে কখনও দেখেনি, এত শব্দ একসাথে সে আগে কখনও শোনেনি , এত মানুষের সমাগম, তার কেন্দ্রে কুমুদ , এত কিছুর মধ্যে সে কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে । প্রবীরের চরিত্রে কুমুদ প্রবেশ করা মাত্র তার উত্তেজনা যেন কয়েক গুন বেড়ে যায় । প্রবীরের সংলাপে সে যখন বলে – 'রাগ করিয়াছ? কেন রাগ করিয়াছ অবোধ বালিকা? কেন এত অভিমান । দুটি চোখে , কেন এত ভর্ৎসনা?' তখন মতির বুকের ভিতরে কেউ যেন ডেকে ওঠে, তার হৃদয় যেন শিরশির করে ওঠে ।

কুমুদের সঙ্গে মতির এই ভালোবাসার অধ্যায় আপাতভাবে শেষ করে কুমুদ চলে যায় কলকাতায় , মতিও কয়েকদিন পর শশীকে বলে তাকে কলকাতা ঘুরতে নিয়ে যেতে । শুধু মতি নয়, সঙ্গে যায় কুসুম এবং পরান । তবে মতির যে আগ্রহে কলকাতা যাওয়া, অর্থাৎ কুমুদকে খুঁজতে, তার দেখা পেতে এবং তার অসম্পূর্ণ ভালোবাসা সম্পূর্ণ করতে তা সে করতে পারেনা কারন সে কুমুদের দেখা পায়না ।ব্যর্থ মনোরথে মতি ফিরে আসে গাওদিয়ায় । তার কয়েকদিন পরেই কুমুদ নিজে গাওদিয়ায় আসে এবং তালপুকুরের ধারে তাদের সাক্ষাত হয়, সেখানে কুমুদ মতিকে প্রেম নিবেদন করে এবং জানায় যে সে মতিকে বিয়ে করে কলকাতা নিয়ে যেতেই গাওদিয়ায় ফিরে এসেছে । মতির স্বপ্ন পুরন হয় । মতি যে তালপুকুরের সামনে বসে তার সুখী সংসারের স্বপ্ন দেখেছিল সেখানে এসেই কুমুদ যেন তার স্বপ্ন পূরণ করে ।

এই কথা শশী জানতে পারে এবং সে বুঝতে পারে কেন মতি তাকে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার জন্য জোর করেছিল । শশী ভাবে – 'এতটুকু মেয়ে মতি,তার যে এমন একটি মন থাকিতে পারে জাহাতে অতন স্নেহের সঞ্চার সম্ভব তা কি কুমুদ জানিত?... মতি? ঐ একরত্তি নোংরা মেয়েটা গোপনে গোপনে এতো ভালবাসিয়াছে কুমুদকে?' শশীর মনে হয় কুমুদের এই বোহেমিয়ান জীবন মতি কিছুতেই সামলাতে পারবেনা এবং সে আরও আশ্চর্য হয় কুমুদের মত একজন কিভাবে এই গ্রামের সাধারন একরত্তি মেয়ের ভালবাসায় শহর ছেড়ে গ্রামে বার বার ফিরে আসতে পারে। মতি অবশেষে কুমুদকে বিয়ে করে কলকাতা পাড়ি দেয় কুমুদের সাথে ।

মতির কলকাতা যাত্রার পর কেটে যায় অনেকদিন, এর মাঝে কোন খবর পাওয়া যায়না মতির । উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদে আবার মতির কথা জানতে পারে পাঠক । জানতে পারা যায় যে মতি এবং কুমুদ তাদের সংসার শুরু করে একটি হোটেলে । সেখানে তাঁরা কোনোভাবে থাকে এবং অভিনব কায়দায় জীবন চালায় । শহুরে জীবনযাপন অছেনা ঠেকে মতির কাছে , সে প্রথম থাকছে এই শহরে । এর আগে সে বেড়াতে এসেছে শুধুমাত্র । বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাথে পরিচয় হয় মতির এই হোটেলে । দিন বারতে থাকে এবং হোটেলে কুমুদের বন্ধুদের আনাগোনাও বারতে থাকে । এই বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই মতিরও বন্ধু হয়ে যায় । মতি এই ধরনের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত নয় । ঘরে তাস খেলা চলে , জুয়া খেলা চলে , মতির ভাললাগেনা, কান্না আসে । মতির দায়িত্ব শুধু চা করা । মতি ভাবে 'কলের মত একহাতে কুমুদের পা টিপিতে অন্যহাতে তাকে চোখ মুছিয়া ফেলিতে হয় । নিজেকে কেমন বন্দিনী মনে হয় মতির । মনে হয়, কুমুদ তাকে চিরকাল এই ছোট ঘরটিতে পা টেপানোর জন্য আতকাইয়া রাখিবে, তাহার খেলার সাথী কেহ থাকিবে না, মাঠ ও আকাশ আর জীবনে পড়িবে না চোখে, বালি মাটির নরম গেঁয়ো পথে আর সে পারিবেনা হাঁটিতে ।'

৯.৪ চরিত্র – কুমুদ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসে যে সমস্ত চরিত্র নির্মাণ করেছেন তার মধ্যে অন্যতম অগোছালো চরিত্র এটি । এই কুমুদ । যার সন্ধে শশীর প্রথম আলাপ হয় কলকাতায় ডাক্তারি পড়তে এসে। কলকাতায় ডাক্তারি পড়ার সময় তার জীবনে যে পরিবর্তন আসে বন্ধু কুমুদের সঙ্গে থেকে , সেই প্রসঙ্গে লেখক বলছেন – 'কলকাতায় থাকিবার সময় তাহার অনুভুতির মার্জনা আনিয়া দেয় বই এবং বন্ধু ...যে দুর্গের মধ্যে গোপাল তাকে পুরিয়া সিল করিয়া দিয়াছিল । কুমুদ তাহা একেবারে ভাঙ্গিতে পারিল না বতে কিন্তু অনেকগুলি দরজা জানালা কাটিয়া বাহিরের আলো বাতাস আনিয়া দিল।' শশীর পরবর্তী জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই কলকাতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় যার জন্য অনেক অংশে কুমুদ দায়ী । সদা প্রাঞ্জল এই কুমুদের সাথেই শশীর আবার দেখা হয় গাওদিয়া গ্রামে যেখানে কুমুদ যাত্রাপালায় অভিনয় করতে যায় । অদ্ভুত ভাবে শশী

সেই সময় নিজেকে কুমুদের চেয়ে উপরের স্থানে বসাতে চেষ্টা করে এবং এই অদ্ভুত স্বার্থপরতা কাজ করে তার মধ্যে । সে নিজেকে বড় মনে করতে শুরু করে । কুমুদ এসবের কিছুই জানতে পারে না। কুমুদ গ্রাম ঘুরে দেখতে থাকে, তার পরিচয় হয় মতির সাথে ।

কুমুদ যাত্রাপালায় অভিনয় করতে গ্রামে আসে এবং শশীর বাড়িতে এসে থাকে । এই সময় তালপুকুরের ধারে সে যায় এবং রবারের একটি জিনিস তার পায়ে ঠেকে, সে তাকিয়ে দেখে সেটি একটি সাপ এবং সেই সাপ তার পায়ে হাঁটুর কাছে কামড়েছে । সুধু কামড়ায়নি বরং তার লেজের পিছন দিয়ে তার পা জড়িয়ে ধরে আছে । এই দৃশ্য দেখে কুমুদ যারপরনাই ভয় পেয়ে যায় এবং তার ধারনা হয় যে সাপটি বিশাক্ত এবং এই সাপের বিষ তার প্রাণ নিয়ে নেবে । ঠিক এমন সময় আতঙ্কগ্রস্ত কুমুদের সামনে এসে উপস্থিত হন মতি । মতি কুমুদকে বলে যে এই সাপ বিশাক্ত নয় এবং এটি তার প্রাণ নেবেনা । এই সাপের বিষ নেই । এই কথা শুনে কুমুদ আস্বস্ত হয় এবং দেহে প্রাণ ফিরে পায় । কুমুদের সাথে মতির এই বন্ধন যেন চিরতরের । যে কুমুদ কোনদিন এক জায়গায় থিতু হয়নি, বরাবর জাজাবরের মত জীবন কাতিয়েছে তার সামনে কি এমন হলো যে সে তার বোহেমিয়ান ছেড়ে দিয়ে সংসার করার কথা চিন্তা করতে লাগলো । জয়া নামের যে মহীয়সী নারী, যে কখন কুমুদের মন হয় করতে পারেনি , কুমুদ কখনও তার মনের জানালা কুলে দেয়নি, কুমুদ কি জানতো এই গ্রাম্য পরিবেশে, এই গাওদিয়ায় এসে তার জানালা খুলতে মতি আসবে ? হয়তো কেউই জানতো না । মতির কাছে এ ভীষণ আশ্চর্যের সময়। যা সে চিরকাল চেয়ে এসেছে , যা সে চেয়েছে শশী ডাক্তারের কাছে, যা সে পায়নি , আচমকাই কোন পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই তা মতির সামনে উপস্থিত । মতি মোহিত হয়ে যায় কুমুদের সামনে । যাত্রাপালা দেখতে যাওয়ার জন্য তার অসীম আগ্রহ তৈরি হয় । যাত্রার আসরে এসে মতি দেখে প্রচুর আলো, এত আলো সে আগে কখনও দেখেনি, এত শব্দ একসাথে সে আগে কখনও শোনেনি , এত মানুষের সমাগম, তার কেন্দ্রে কুমুদ , এত কিছুর মধ্যে সে কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে । প্রবীরের চরিত্রে কুমুদ প্রবেশ করা মাত্র তার উত্তেজনা

যেন কয়েক গুন বেড়ে যায় । প্রবীরের সংলাপে সে যখন বলে – 'রাগ করিয়াছ? কেন রাগ করিয়াছ অবোধ বালিকা? কেন এত অভিমান । দুটি চোখে , কেন এত ভর্ৎসনা?' তখন মতির বুকের ভিতরে কেউ যেন ডেকে ওঠে, তার হৃদয় যেন শিরশির করে ওঠে ।

কুমুদ এবং মতির এই ভালোবাসার মাঝে শশী থাকে, সেই শশী যাকে মতি এক সময়ে তার গল্পের নায়কের স্থান দিয়েছিল , সেই শশীর মনে অদ্ভুত খেলা চলতে থাকে । সে ভাবতে থাকে এই Foxtrot Waltz নাচা কুমুদ তাদেরই গ্রামের একরত্তি মেয়ে মতির প্রেমে পড়লো?

কুমুদের সাথে মতির বিয়ে হয় । বিয়ের পর কুমুদের অদ্ভুত বোহেমিয়ান এবং ক্লীব জীবন লক্ষ্য করতে থাকে মতি । কুমুদের গভীর মনস্তত্ত্ব নেই, যা আছে তা হল এক বিভ্রাট এবং বিভ্রান্ত জীবন যা নিয়ে সে একটুও ভাবিত নয়। কারন সে জানে শেষমেশ কিছু একটা হয়ে যাবে । এবং প্রতি ক্ষেত্রে হয় ও তাই । বাড়ি বদল হয় । বিভিন্ন বাধা পেরিয়ে চলতে থাকে কুসুম এবং মতির সংসার । এরই মধ্যে শশীর এবং পরাণের সঙ্গে দেখা হয় মতির । এরই মধ্যে মতিকে গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় তাঁরা । কুমুদ আবার যোগ দিতে চায় যাত্রার দলে, আরেক অনিশ্চিত বোহেমিয়ান জীবনে । মতির কাছে সুজগ থাকে সেই বোহেমিয়ান জীবনে অনিশ্চয়তা ছেড়ে গ্রামের নিজের পরিবেশে ফিরে যাওয়ার । কিন্তু সেই সব সত্বেও মতি ফিরে যায়না । মতি থেকে যায় কুমুদের সাথে , পাড়ি দেয় অন্য এক অনির্দেশে উদ্দেশ্য করে।

৯.৫ চরিত্র – যাদব

গাওদিয়া গ্রামের মান্যগন্য লোক এই যাদব পণ্ডিত । এই চরিত্রটি উপন্যাসে অন্য মাত্রা যোগ করে । লেখন এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে অন্য এক স্তর রচনা করেছেন উপন্যাসে । শ্রীনাথের দোকানে শশী ও অন্যান্যরা যখন বসে গল্প করে তখন দেখা যায় দূরে কোন এক রাস্তা ধরে এক হাতে লাঠি বগলে ছাতা পায়ের চপ্পল আর একহাতে ক্যাম্বিসের ব্যাগ এবং গায়ে উড়ানি সহ আসেন যাদব পন্ডিত। তাকে দেখে বোঝা যায় তিনি

কলকাতা থেকে আসছেন । তিনি থাকেন শশী ডাক্তারের বাড়ির পাশে ।যাদব পণ্ডিতের বাড়ির অন্য পাশে যামিনী কবিরাজের বাড়ি ।

শশী ডাক্তার অনেক চেষ্টা করেও বুঝতে পারেন না যাদব পন্ডিত কেন তার যুবক বয়সে গৃহত্যাগ করেন এবং সাধকে পরিণত হন । যাদব পন্ডিত গ্রামে গ্রামে ঘুরে বহু মানুষের সম্মান এবং শ্রদ্ধা পেয়েছেন কিন্তু তিনি একটি ও শিষ্য করেননি কখনও ।

পুতুল নাচের ইতিকথা উপন্যাসের আমরা চরিত্রের দ্বৈত রূপ দেখতে পাই । আমরা আগে যেমন শশী ডাক্তারের কুসুমের মতির এবং কুমুদের দ্বৈত চরিত্র দেখতে পেয়েছি তেমনই যাদব পন্ডিত এর দ্বৈত চরিত্র আমরা এই উপন্যাসে দেখতে পাই । তিনি একসময় শশীকে বলেন সূর্য বিজ্ঞান করায়ত্ত থাকায় সব তার নখদর্পণে , এমনকি তার মৃত্যুর দিনটিও তিনি স্থির করে রাখতে পারেন । শশী যখন তাকে জিজ্ঞেস করেন যে সেই দিনটি কি তখন তিনি রথের দিনের কথা বলেন ।

যাদব পন্ডিত শশীকে যা বলেন তা কথার পৃষ্ঠে বলেন এবং না ভেবেই বলেন । তিনি ভাবতে পারেননি যে গোটা গ্রাম সেই কথা জেনে যাবে । শশী কুসুমকে এই কথা বলে এবং সম্ভবত কুসুম সারা গ্রামে এই কথা ছড়িয়ে দেন ।

এর ফলে যাদব পণ্ডিতের কাছে ধর্ম সংকট দেখা দেয় । একদিকে তার প্রাণ এবং অপর দিকে তার সম্মান । তিনি সারাজীবন গ্রামে গ্রামে ঘুরে তার জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ বিসর্জন দিয়ে সাধক বৃত্তি করে যে সম্মান শ্রদ্ধা অর্জন করেছে আজ এই মুহূর্তে তার একটি কথায় এবং একটি কাজে সেই সম্মান তিনি হারাতে পারেন শুধুমাত্র এই সম্মান হারানোর ভয় যাদব পন্ডিত হাসিমুখে আফিম খেয়ে তার স্ত্রী পাগল দিদির সাথে আত্মহত্যা করেন এবং তিনি মৃত্যুর আগে অর্থাৎ যখন সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে সেই সময় তিনি শশী ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসেন ।

সেই হাসির মর্ম প্রথমে আমরা বুঝতে পারি না । শশীও বুঝতে পারেনা সেই হাসির মধ্যে যে অদ্ভুত কটাক্ষ মেশানো রয়েছে ।

৯.৬ চরিত্র – গোপাল

পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসে গোপাল এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র । তার কারন শুধুমাত্র এই নয় যে সে গ্রামের বয়স্ক ব্যাক্তি এবং উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শশী ডাক্তারের পিতা , তার কারন এই যে তার চরিত্রটি লেখক অদ্ভুতভাবে বুনেছে। গোপাল আপাতভাবে একজন অর্থলোভী এবং সে মানুষ বিক্রি করে । কিন্তু এই কঠিন বাস্তব চরিত্রের মধ্যেও তার কোথাও একটা মমতা আছে, তার পুত্র এবং কন্যাদের প্রতি তার আপত্য স্নেহ আছে যা লেখনের সুচারু লেখনীতে ফুটে উঠেছে । শশী গোপালের এক মাত্র পুত্র হলেও তার তিনজন কন্যা ।

গ্রামের অন্যতম প্রধান ব্যাক্তি যামিনী কবিরাজের বৌ সেন দিদির সাথে গোপালের অবৈধ সম্পর্কের কথা গ্রামে সকলে জানে । শশী ছোট থেকে দেখে সেন দিদি তাকে নিজের ছেলের মত মানুষ করে । সেন দিদি অপরূপ সুন্দরী । তার সৌন্দর্যের প্রসংশাও সকলে করে । সেন দিদির বসন্ত ধরা পরলে গোপাল তার পুত্র শশীকে চিকিতসা করতে না করেন । কারন গোপাল চায়নি সে সেন বসন্ত রোগের চিকিৎসা করুক এবং তাতে অপমান হোক যামিনী কবিরাজের । গোপাল উস্কানি দেয় যামিনী কবিরাজকে এবং তার উস্কানিতে যামিনী কবিরাজ অপমান করেন শশীকে। কিন্তু তাতেও লাভ হয়না । সেন দিদিকে চিকিৎসা করে সারিয়ে তোলে শশী । এরপর সেন দিদির যাতায়াত বেড়ে যায় গোপালের বাড়িতে । যে অবৈধ সম্পর্কের কথা গ্রামে সবাই আলচনা করে সেই অবৈধ সম্পর্ক ক্রমে বাড়তে থাকে । শশী যখন চলে যেতে চায় এই গ্রাম ছেড়ে তখন এই লোভী গোপাল পুত্রকে বলেন- ‘পরশু তোর যাওয়া হয়না শশী, আমি আজ বাবার কাছে কাশী যাচ্ছি , সাত আটদিন আশ্রমে থাকব । একজনের বাড়িতে না থাকলে চলবে না । আমি ফিরলে যা হয় করিস’- তারপর সেই আবার শশীর দ্বিধাগ্রস্ত মন দেখে বলে ‘না যদি থাকতে পারিস বল, যাওয়া বন্ধ করি । অদেষ্টের লেখা কে খণ্ডাবে ।’

এই কথা বলায় শশী নরম হয় এবং গোপাল কাশী যাত্রা করে । একে একে দিন কেটে যায় কিন্তু সে ফিরে আসেনা । 'সেই যে গেল গোপাল আর ফিরিল না । সংসারী গৃহস্থ মানুষ সে, সমস্ত জীবন ধরিয়া ফল পুষ্প শস্যদাত্রী ভূমিখণ্ড, সিন্দুক ভরা সোনারূপা, কত গুল মানুষের সাথে পারিবারিক এবং আরও কতগুলি মানুষের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক, দায়িত্ব , বাধ্য-বাধকতা প্রভৃতি যত কিছু অর্জন করিয়াছিল সব সে দিয়া গেল শশীকে , মরিয়া গেলে যেমন সে দিত ।'

সেন দিদি, পাগলদিদি, যাদব পণ্ডিত, যামিনী কবিরাজের মৃত্যু হয় তার চোখের সামনে । সেন দিদির সাথে তার সম্পর্কের গভীরতা লেখক নিপুনভাবে অঙ্কন করেছেন উপন্যাসে । এছাড়াও বাকি সকলে তার খুব কাছের লোক ছিলেন, সকলের সাথে মতের মিল না হলেও কাউকে শশী অস্বীকার করতে পারেনা । এদের মৃত্যু যেমন শশীকে একা করে দেয় ঠিক তেমনই কুসুম, গোপাল এবং পরানের গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়া শশীর জীবনকে এক বন্ধ গলির সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় । শশী কোথাও যেতে পারেনা এবং তাকে গ্রামেই থেকে যেতে হয় । সে এই গ্রামে থাকে এবং তার মনে হয় সে এখানে আটকে পরেছে ।

গোপালের নিষ্ক্রমণের আগে সেন দিদি এক সন্তানের জন্ম দেয় । সকলেই জানে সেই সন্তান গোপালের , এবং কুন্দর থেকে সেই ছেলেকে নিয়ে গোপাল চলে যায় কাশীতে গুরুদেবের আশ্রমে । কুন্দকে তার বদলে উপঢৌকন দেন গোপাল । শশী থেকে যায় একা । সেই একাকীত্ব এবং নিজের লকেদের মৃত্যু ধীরে ধীরে তার মনস্কে গ্রাস করতে থাকে ।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১. পুতুল নাচের ইতিকথা উপন্যাসের কুসুমের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে লেখ।

উত্তর-কুসুমের চরিত্রের দ্বন্দ্ব তখন থেকেই শুরু হয় যখন কুসুম মতির শরীর সম্বন্ধে মিথ্যে বলতে থাকে শশী ডাক্তারকে । সে মতিকে এক রকম কথা বলে আবার মতির বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্য কথা বলে শশী ডাক্তারকে । সে বলে- 'রোজ একবার এলেই হয়?

জ্বরে ভুগছে মেয়েটা, দেখে তো যাওয়া উচিত? কদিন আসেননি বলে বাড়ির সবাই কত কথা বললে ছতবাবু । বললে শশী আমাদের মস্ত ডাক্তার হয়েছে , না ডাকলে আর আসা হয়না । মতি কি বললে জানেন? – ছোটবাবুর অহঙ্কার হয়েছে ।' কুসুম এভাবেই অনায়াসে সাজিয়ে গুছিয়ে বানিয়ে কথা বলে, কোথাও তার এতটুকুও দ্বিধা কাজ করেনা।

২. কুসুমের চরিত্রের একটি বিশেষ দিক সম্পর্কে লেখ।

উত্তর-কুসুমের চরিত্রের অন্যতম প্রধান দিক হল তার স্পষ্ট ভাষা । সে শশীর বাড়ি যায় পেটে ব্যাথার মিথ্যে অজুহাতে এবং গিয়ে শশীর সাথে গোলাপ চারা মাড়িয়ে দিয়ে তার সহজাত নির্লিপ্ত বদনে বলে 'ইচ্ছে করেই দিয়েছি ছোটবাবু । চারার জন্য এত মায়া কেন?' শশীর ভালোবাসার চারাগাছ মাড়িয়ে সে প্রমাণ করতে চায় যে ওই গোলাপচারার মধ্যে শশী কি এমন দেখতে পায় যা কুসুমের মধ্যে নেই? যে ভালোবাসা শশী ওই গোলাপচারাকে দেয় সেই ভালোবাসা আসলে তো কুসুমেরই প্রাপ্য । এই স্পষ্ট কথা কুসুম ব্যাক্ত করে তার এই ছোট কাজের মধ্য দিয়ে ।

৯.৭ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পুতুল নাচের ইতিকথা উপন্যাস শশী চরিত্র আলোচনা করো।

২. পুতুল নাচের ইতিকথা উপন্যাস কুসুমের চরিত্র আলোচনা করো।

৩. পুতুল নাচের ইতিকথা উপন্যাসের নায়ক ছাড়া আরো দুজন পুরুষ চরিত্রের আলোচনা কর।

৯.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়--- নিতাই বসু

২. বক্তব্য---ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

৩. নিয়তিবাদ উদ্ভব ও বিকাশ--- সুকুমারী ভট্টাচার্য।

একক ১০ পুতুল নাচের ইতিকথা- উপন্যাসে কুসুমের মনস্তত্ত্ব

বিন্যাসক্রম

১০.১ উপন্যাসে কুসুমের মনস্তত্ত্ব

১০.২ উপন্যাসে মৃত্যু চেতনা

১০.৩ মূল কাহিনী এবং গৌণ কাহিনীর যোগসূত্র

১০.৪ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১০.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১০.১ উপন্যাসে কুসুমের মনস্তত্ত্ব

বাংলা সাহিত্যে নারীচরিত্র সর্বদা গভীর এবং জটিল মনস্তাত্ত্বিক রুপে অঙ্কিত হয়েছে । শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য সাহিত্যিকদের লেখায় বিভিন্ন নারীচরিত্রদের উপস্থিতি আমরা দেখতে পাই যা গভীর এবং জটিল মনস্তত্ত্বের পরিচায়ক । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার পুতুল নাচের ইতিকথা উপন্যাসে কুসুম চরিত্রের অঙ্কন করেছেন এক জটিল এবং অতলান্তিক গভীরতার মধ্য দিয়ে । কুসুম এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র এবং শশী ডাক্তারের সাথে তার সম্পর্কের অদ্ভুত উত্থান এবং পতন এই গোটা উপন্যাস জুড়ে পাঠকের মনস্তত্ত্বে এক গভীর প্রভাব রেখে যেতে সমর্থ হয় ।

পুতুল নাচের ইতিকথা এককথায় মানুষের জীবনের অদৃশ্য নিয়তি,অলক্ষ্য জীবনের টানে নানা ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে--- তারই কাহিনী।উপন্যাসের অনেক চরিত্রই এদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ।যাদব পন্ডিত ও তার স্ত্রী পাগলদিদি,যামিনী কবিরাজ ও

তার অসাধারণ সুন্দরী স্ত্রী শঙ্করী,সেনদিদি,শশীর পিতা গোপাল কুসুম মতি শশী---সবাই গাওদিয়ার গ্রামজীবনে বিশেষ তাৎপর্যময় জীবনযাপন করেছে।কিন্তু তবুও উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত শশী ও কুসুমের রহস্যময় প্রেম সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা ও সেই সম্পর্ক ভাঙার ব্যাথারই কাহিনী।

শশী উপন্যাসের নায়ক ও সেই মূলসূত্রে কুসুম উপন্যাসের নায়িকা।অবশ্য পরবর্তীকালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়তির অদৃশ্য সুতোর টানের কথা স্বীকার না করে বলেছেন উপন্যাসের চরিত্রগুলো যে পুতুল নাচের মতোই নেচে চলেছে তার প্রেক্ষাপটে আছে মানুষেরই বাস্তব সমাজেসমাজে নানা শক্তির সংঘাত ও চরিত্র গুলির পরস্পর বিরোধী আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব।অর্থাৎ এই উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের যে পরিণতি ঘটেছে তার দায় সেই সব চরিত্রগুলির নিজেদেরই,কোনো অলৌকিক নিয়তির শক্তি নয়।এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় লেখক শশী ও কুসুমের যে প্রেমকাহিনী রচনা করেছেন তার ভিত্তিতে আছে বাস্তব মনস্তত্ত্ব ও তার রহস্যময় ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া।

আর সেই মনস্তাত্ত্বিক কাহিনীর কেন্দ্রে কুসুম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। যার মধ্য দিয়ে লেখক ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কে বিশ্লেষণ করেছেন। কুসুম একটু একটু করে ভেতরের দিকে নানা আবরণ ভেদ করে ফুটে উঠতে চেয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'ঝরে গেছে কুসুম'।এই উপন্যাসে কুসুমের আবির্ভাব ভীষণ অনাড়ম্বর ভাবে , শশী ডাক্তার পরাণের বাড়িতে যায় মতিকে পরীক্ষা করতে, সেই সময়ে লেখক লিখছেন – ‘কুসুম গিয়াছিল ঘাটে’ । সেই প্রথম উপন্যাসে কুমুমের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এটি । কুসুম এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র হলেও তার পরে গোটা সময় জুড়ে কুসুমের যে গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ চলবে তার কোনো আভাস উনি দেননি শুরুতে । ভীষণ নির্লিপ্তভাবে কুসুমের উপস্থিতি বর্ণনা করেন লেখক । এই নির্লিপ্ততার মধ্য দিয়ে আসন্ন খেলার কোন আভাস তিনি দেন না।

কুসুমের চরিত্রের দ্বন্দ্ব তখন থেকেই শুরু হয় যখন কুসুম মতির শরীর সম্বন্ধে মিথ্যে বলতে থাকে শশী ডাক্তারকে । সে মতিকে এক রকম কথা বলে আবার মতির বিষয়ে

সম্পূর্ণ অন্য কথা বলে শশী ডাক্তারকে । সে বলে- ‘রোজ একবার এলেই হয়? জ্বরে ভুগছে মেয়েটা, দেখে তো যাওয়া উচিত? কদিন আসেননি বলে বাড়ির সবাই কত কথা বললে ছতবাবু । বললে শশী আমাদের মস্ত ডাক্তার হয়েছে , না ডাকলে আর আসা হয়না । মতি কি বললে জানেন? – ছোটবাবুর অহঙ্কার হয়েছে ।’ কুসুম এভাবেই অনায়াসে সাজিয়ে গুছিয়ে বানিয়ে কথা বলে , কোথাও তার এতটুকুও দ্বিধা কাজ করেনা । সে এমনই নির্লিপ্ত , কিন্তু তার মধ্যে যে চাওয়া রয়েছে, যে কামনা রয়েছে তা সেই নির্লিপ্ত স্বভাবের মধ্য দ্যেও ফুটে ওঠে , তা পাঠক যেমন বুঝতে পারেন, তেমন বুঝতে পারে শশী ডাক্তার । ‘তাই শশী আগাইয়া যায়, বলে আমার কাজ আছে বৌ । কাল এসে তোমার মিথ্যে কথা শুনবো ।’

লেখক শশীর পরিচয় দিয়েছেন এই ভাবে যে "শশীর চরিত্রে দুটি ভাগ স্পষ্ট আছে। একদিকে তাহার মধ্যে যেমন কল্পনা ভাবাবেগ ও রসবোধ এর অভাব নাই,অন্যদিকে তেমনি সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধি ও সম্পত্তির প্রতি মমতাও তাহার যথেষ্ট। তাহার কল্পনাময় অংশটুকু গোপন ও মূক... তাহার বুদ্ধি সংযম ও হিসেবে প্রকৃতির পরিচয়ই মানুষ সাধারণত পায়"। এমন সুশীল প্রতি অন্তরের অবদমিত প্রেম কামনা রহস্যময় টানাপোড়েনে কুসুমের চরিত্র অদ্ভুতভাবে আক্রান্ত। সংসারে কেউই এমনকি শশী ও আচরণের মধ্যে কোন অসঙ্গতি খুঁজে পায়না। স্বামী পরানের প্রতি তার ঠিক কী রকম মনোভাব তার কোনো স্পষ্ট পরিচয় লেখক আমাদের দেননি। কিন্তু পরানের সংসারে শাশুড়ি মোক্ষদা এবং ননদ মতি কে নিয়ে কুসুম যেভাবে দিন যাপন করে সাংসারিক কাজকর্ম যে রকম আচরণ করে অনেক সময় তার রহস্যের হদিস মেলে না। অনায়াসে সে মিথ্যা কথা বলে। সে বিষয়ে তার কোন সংকোচ নেই। মতিকে ওষুধ না দিয়ে দিয়েছি বলতে তার কোন অসুবিধা হয় না। সামান্য কারণে পরিজনদের সঙ্গে কলহ করতে তার বাধে না। কুসুমের বাবা এই বিষয় মনে করেন কুসুম ছোট মেয়ে বহু আদরে মানুষ হওয়ায় সে একটু খামখেয়ালি প্রকৃতিরও।অকারনে খামখেয়ালি বলে স্নেহ মিশ্রিত প্রশ্রয় দিয়েছেন "কত বছর আর কুসুমের পাগলামি দেখে গেছেন"। কিন্তু বেশ বোঝা যায় কুসুমের এই অসভ্য আচরণ ও পাগলামি লঘু স্বভাবের ফল নয়। এর সবকিছু পশ্চাতে কারণ আছে। তার পিতা

সচ্ছল অর্থবান লোক তার কাছে পরানের অনেক কিছুই বন্ধক আছে।সুতরাং স্বামীর গৃহে কুসুমের প্রতিপত্তি স্বাভাবিকভাবেই বেশি। সেই সঙ্গে আছে প্রবল আত্মমর্যাদাবোধ। সে জমিদার বাড়ির মেয়েদের অবজ্ঞা সহ্য করে পাশে বসে যাত্রা দেখতে রাজি হয়নি। কুমুদ তাকে ব্রাহ্মণ ভেবে তুচ্ছ করতে চেয়ে তুমি সম্বোধন করলে সঙ্গে সঙ্গে কুসুম জবাব দিয়েছে কথা বলতে শেখো নি দেখছি তুমি।ভদ্দর লোক তো! গ্রাম সমাজের নানা সংস্কার সে অনায়াসে অমান্য করেছে নিজের বুদ্ধিতে যা ভেবেছে তা স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ বা কুণ্ঠাবোধ করেনি। তাই যাদব পণ্ডিতের স্বেচ্ছামৃত্যু নিয়ে গ্রামের মানুষজন যখন উচ্চকণ্ঠ কোলাহল মুখর হয়েছে তখন কুসুম সহজে বিদ্রুপ করেছে---- " যা সব মজার কান্ড!গাঁয়ে সত্তর বছরের একটা বুড়ো মড়বে তাই নিয়ে দশটা গাঁয়ের লোক হৈ হৈ করছে।বেঁচে থাকলে আর কত দেখব"। এইরকম আত্মবোধ থেকে সে অনায়াসে উদ্ধত ভঙ্গিতে উনুন থেকে জ্বলন্ত কাঠ এনে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বেলেছে। সংসারের কোন ক্ষেত্রেই সে হার মানতে প্রস্তুত নয়।সে যত তুচ্ছ বিষয়ই হোক।অথচ মাঝে মাঝেই তারা আচরণে অদ্ভুত বালিকা সুলভ চাপল্য দেখা যায়। বয়সের ছাপ তখন তার অঙ্গ থেকে একেবারে ঝরে পড়ে। অথচ সাংসারিক বুদ্ধি যে ছিল তা নয়।বহু সময় ব্যক্তিগত জীবনে বিশেষ করে বিন্দু রানীর করুণাতুর ব্যাপার শশী আর কারোর কাছে না বলে কুসুমের কাছেই বলেছে। এমনই কুসুমের মেজাজ ও আচরণ যে সবাই তাকে অনেকটাই পাগলামি বলে মনে করে।

অথচ এই উপন্যাসের পাঠক হিসেবে আমাদের একটুও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কুসুম চরিত্র ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব এর এক নিখুঁত উদাহরণ। ফ্রয়েড মানুষের অবচেতনেই যে অবদমিত কামনার অদ্ভুত রহস্য আবিষ্কার করেছেন তারই সূত্র ধরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কুসুম চরিত্রটি কে সৃষ্টি করেছেন। কুসুমের সমস্ত আচরণে প্রেক্ষাপটেই আছে শশী। শশীর প্রতি তার অবদমিত প্রেম কামনার তারণা।নানাভাবে শশীর মনকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছে সে। কিন্তু শশীর মধ্যে যে কল্পনা কাজ করতো কুসুমের মধ্যে প্রেম বাসনা সেইরকমভাবে তেমন করে রূপ পায়নি। তার

সমস্ত প্রেম আকর্ষণ এর মধ্যেই ছিল ফ্রয়েড কথিত দেহ বাসনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। এই ব্যাপারটি নানাভাবে কুসুম শশীর কাছে প্রকাশ করেছে। কিন্তু সুশীল মনে এর কোন অনুকূল প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। একেবারে শেষ সময় যখন কুসুম গাওদিয়া গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে মনঃস্থির করেছে তখন শশীর অবচেতনেই কুসুমের জন্য একটা ভীষণ কামনার আকর্ষণের সৃষ্টি হয়েছে তা সে টের পেয়েছে। কিন্তু ততদিনে কুসুমের মনের আগুন নিভে গেছে। কুসুম সম্পূর্ণ বুঝে গেছে শশীর প্রতি তার সেই কামনার কিছুই অবশিষ্ট নেই। তাই খুব স্পষ্ট করেই সে বলেছে-

"লাল টকটকে তাতানো লোহা ফেলে রাখলে তাও আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে যায়। যায় না?কাকে ডাকছেন ছোট বাবু?কে যাবে আপনার সঙ্গে? কুসুম কি বেঁচে আছে?,সে মরে গেছে"।

কুসুমের মনের এই আকস্মিক মৃত্যু ভিতরে ভিতরে একেবারে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল। কুসুম শশীর সম্পর্কের টানাপোড়েন শেষপর্যন্ত ব্যক্তির আর্থিক সংকটের আধুনিকতায় শশীকে গ্রামে থেকে যেতে বাধ্য করল। অন্যদিকে কুসুম চরিত্রের এই পরিণতি খুবই স্বাভাবিক। ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান তত্ত্ব অনুযায়ী অবচেতন মনে অবদমিত কামনা এমনি করেই বারবার আঘাত পেতে পেতে শেষ পর্যন্ত একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায়। কুসুম চরিত্রটি এদিক থেকে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে এক বিরল ব্যতিক্রমী চরিত্র।

১০.২ উপন্যাসের মৃত্যু চেতনা

পুতুল নাচের ইতিকথা উপন্যাসের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি এঁকেছেন তার দুটি সূত্র জীবন-মৃত্যু। আস্তে মাথা পুতুলগুলো সংসারে বাঁধা বিভিন্ন মানুষজন তাদের অন্তর হিংসাভাব বৈচিত্র এবং অসংখ্য ক্রীড়া কর্মে বিভিন্ন স্তর। কুসুমের বাবা অনন্ত বলেছেন----"পুতুল বৈ তো নই আমরা।একজন আড়ালে বসে খেলাচ্ছে"। অভিমান সম্পূর্ণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব নয়। তার মধ্যে মানুষ যে সুতোর টানে পুতুলের মত সংসারের নিতে চলেছে তা অলৌকিক দেব শক্তি নয়।আমাদের "Life Force" বা

আত্মশক্তি। আরেকদিকে অনিবার্য মৃত্যু অপ্রতিহত ক্ষমতার টানাপোড়েন। তাই মানুষের বিস্তারিত জীবন ও রহস্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদে যুক্ত মৃত্যুরহস্য। এক থেকে জীবনের প্রতি অসীম ক্ষমতা অন্যদিকে মৃত্যু অনিবার্য জনিত ভীতি ও শোক। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব অধীত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তারপর 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের আগাগোড়া জীবন ও মৃত্যুর দাম্ভিক দ্বন্দ্বকে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসিক দেখিয়েছেন উপন্যাসে একেকটি মৃত্যুর অভিজ্ঞতা এক এক রকম। মৃত্যুর বিরুদ্ধে "লড়াই করিবার ভাড়া করা সৈনিক" শশীর Life Force, তেমন একটু একটু করে অবহিত হয়ে অবশেষে এক Eternal Voyage তথা অবসন্ন শূন্যতায় পৌঁছে দিয়েছেন। উপন্যাসের প্রারম্ভে কলকাতা শহরের পাশ করা ডাক্তার শশী গাওদিয়া প্রবেশ করেছেন।ষ হারু ঘোষের বজ্রাঘাতে মৃত দেহ বহন করে। শশী নতুন করে জীবন আরম্ভের সূচনাতেই হারুন অপঘাত মৃত্যু আকস্মিকতা আঘাতে মৃত্যুর বিপরীতে জীবনের অতি কাম্য উপভোগ্যতা সম্পর্কে শশীকে এক নতুন জীবনবোধে পৌঁছে দিয়েছে। হারুর মৃত্যুর আঘাতে গভীরভাবে নাড়া খেয়েছিল জীবনের প্রতি তার মমতা।

ক্রমে 10 বছর গাওদিয়া বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে এসে উপলব্ধি করেছে গ্রামের মানুষ গুলোর নিরন্তর জীবন সংগ্রাম। তবু একের পর এক অভিঘাত এসেছে জীবনের উপর। আর জীবনেও মৃত্যুর টানাপোড়েনে সংসারের মানুষগুলো জীবনযাত্রা ছন্দটা ও পাল্টে গেছে। এক একটি মৃত্যুর বিচিত্র রূপ এবং তার আঘাতের ফলও ভিন্ন। আরম্ভে যে জীবনের সারানি এস সি গ্রামে প্রবেশ করেছিল উপন্যাসের শেষে ক্লান্ত রিক্তভাবে স্বপ্নাহত শশী গ্রামে ফিরেছে। যেন তার মৃত্যুতুল্য জীবনটাকে কোনমতে বহন করে। শশীর এই জীবনীশক্তি ক্রমশ কত হয়েছে লেখক বর্ণনা করেছেন---

"মাটির টিলার উপর উঠিয়া সূর্যাস্ত দেখার শখ এ জীবনে আর একবারও শশীর আসিবেনা"।

শশী চেয়েছিল জীবনটাকে নিজের ইচ্ছায় গড়ে নিতে। কিন্তু বাস্তবে সে দেখলো সে নিজে এবং তার পরিচিত যাদব পন্ডিত পাগল দিদি সেন দিদি যামিনী কবিরাজ

বিন্দুবাসিনী গোপাল কুসুম সকলেই জীবন সন্ধানী হয়েও ঠিকমতো বাঁচতে না জেনে অজানা পথে ভুল পথে জীবন থেকে হারিয়ে গেছে অথবা অন্যমনস্কতা অপচয়িত জীবনের ক্লান্তি হতাশা রিক্ততার ক্রম ক্ষয়িত মৃত্যুতুল্য জীবন টেনে নিয়ে চলেছে শারীরিক মৃত্যুর দিকে।

চিকিৎসক বলে শশীর কাছে মৃত্যু স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ বাস্তব। শশী এও জানে ডাক্তার হিসেবে সে ক্ষণিকের জন্য মৃত্যু থেকে রাখতে পারে। কিন্তু মৃত্যুর অনিবার্য তাকে প্রতিহত করার ক্ষমতা তার নেই। সেই অর্থে যাদের সে চিকিৎসা করেছিল তাদের কাউকেই সে বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি। বাসুদেব বাড়ুজ্যের ছেলে ভুতোকে বাঁচাতে পারেনি সে। যামিনী কবিরাজের সুন্দরী স্ত্রী হিন্দি সুচিকিৎসায় বসন্ত রোগ থেকে মুক্ত হলেও তার সৌন্দর্য শশী রক্ষা করতে পারেনি। একটা চোখ নষ্ট হয়েছে সেন দিদির। শশীর সামনেই সেন দিদি প্রায় অর্ধ মৃত্যু ঘটে গেছে। মানসিক বিকারগ্রস্ত সেন দিদি শেষ পর্যন্ত গোপালের অবৈধ সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা গেছে। এক্ষেত্রে শশীর বাস্তবতাবোধ অলক্ষ্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার ডাক্তারি বিদ্যা প্রয়োগের পক্ষে। মন থেকে সায় মিলল না তার। যার প্রতি একটা সুন্দর পৃথিবী ভাবছিল সেটির অপমৃত্যু শেষপর্যন্ত সেন দিদির বাস্তব মৃত্যুতে ঘটলো।

আমার জীবনের এক একটি গ্রন্থিতে অবিশ্বাসী যন্ত্রণা মানুষকে আত্মক্ষয় প্ররোচিত করে কেমন ভাবে যামিনী কবিরাজের মৃত্যু তার প্রমান। সন্দেহপ্রবণ যামিনী কবিরাজ শশীর প্রতি ভয়ঙ্কর বিরূপ ছিলেন এবং বসন্ত রোগের চিকিৎসায় তার স্ত্রী ডাক্তারের উপরে আস্থা রেখে ছিল সেটাও তার কাছে আক্রোশের কারণ। সেন দিদির প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ এখানে কাজ করেছে। ফলে ক্ষয় রোগের আক্রমণ অনুভব করলেও যামিনী কবিরাজ মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ও শশীর কাছে কিছুতেই হার মানতে চাননি। সংস্কারে বা অহংকার জীবনের প্রতি চিরকালীন মমতাকেও যে অতিক্রম করে মৃত্যুকে বরণ করার ঘোর সম্মোহন সৃষ্টি করতে পারে যাদব পন্ডিত আর পাগলা দিদি আত্মহননে তার পরিচয় পেল শশী। সমস্ত গ্রামবাসীর কাছে নিজের সূর্য বিজ্ঞানের অভ্রান্ততা প্রমাণ করার জন্য এবং সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের কাছ থেকে ভক্তি-শ্রদ্ধা আদায়ের জন্য অসম্ভব

আফিম খেয়ে মৃত্যুবরণ করেছে যাদব পন্ডিত। তার অনুগত হয়েছে পাগলা দিদি। যাদব পণ্ডিতকে সাধারণ মানুষের কাছ থেকেই ভক্তি-শ্রদ্ধা লাভের লোভে ঊর্ধ্ব আকাঙ্ক্ষায় শশীকে বাধ্য করল তাদের এই ছলনা মেনে নিতে। পরোক্ষে শশী তাদের মৃত্যুর কারণ হয়েছে। নিজেরই তৈরি পরিস্থিতিতে শশীকে বুঝতে হলো তার অসহায়তা কতখানি। একেই বলা যেতে পারে অদৃশ্য নিয়তি শক্তির অধীনতা।

কিন্তু দৈহিক মৃত্যুই নয় বাস্তবে অবদমিত লিবিডোর খেলায় কিভাবে তার আত্মিক মৃত্যু ঘটে তার বিচিত্র উদাহরণ উপন্যাসে দিয়েছেন লেখক এবং নির্ভুল ভাবে দেখিয়েছেন এই আত্মিক মৃত্যুর প্রেক্ষাপটে বাস্তবে রয়েছে মানুষের অবচেতন কামনা-বাসনার জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। কোনটাই অদৃশ্য অলৌকিক ঐশী শক্তির খেলা নয় সুতোর টানে আমরা পুতুলের মত নেচে চলি। তা আসলে আমাদেরই সব অবদমিত ইচ্ছার টান। লেখক এর এই উপলব্ধি যে কতখানি সত্য তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ উপন্যাসের সবচেয়ে বেশি ক্ষতবিক্ষত চরিত্র কুসুম। তুলনায় হয়তো শশীর অভিজ্ঞতা আরো জটিল। কিন্তু যন্ত্রণার তীব্রতায় অবশেষে নিষ্ফলতা শূন্যতায় পৌঁছানো কুসুমের আত্মিক মৃত্যু এই উপন্যাসের পুতুলনাচের সবচেয়ে বড় উদাহরণ। প্রতিক্ষণেই শশীর প্রতি তার ভালোবাসা উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। কামনার উগ্রতায় কখনো কখনো শশীর কাছে তার আচরণ অস্বাভাবিক বেসামাল পাগলামিতে পরিণত হয়েছে এবং শেষপর্যন্ত কুসুমের অবচেতন লিবিডোর ক্রিয়া একটা সমাপ্তিতে পৌঁছেছে যখন কুসুম নিজেই ঘোষণা করেছে----"লাল টকটকে করে তাতানো লোহা ফেলে রাখলে তাও আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে যায় । যায় না?... কাকে ডাকছেন ছোটবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে?কুসুম কি বেঁচে আছে?সে মরে গেছে ।' যতদিন কুসুমের দেহমন তাতানো লোহার মতই গনগনে ছিল ততদিন শশীর মনে কোনো স্পষ্ট আকর্ষণ জন্মায় নি। মতির বিষয়ে শশীর ডাক্তারিতে কুসুমের ব্যঙ্গোক্তি গুলি শশীর মনে বিরূপতার সৃষ্টি করেছে। শশীর জানলার কাছে এসেছিল শশীর বোনা গোলাপ চারা। তা মাড়িয়ে কুসুম তার মনের কষ্ট মিটিয়ে নিল। এক্ষেত্রে কুসুমের ভালোবাসার আক্রোশ শশী বুঝতে পারেনি। বুঝবার মত মন তখন তার ছিল না। কিন্তু বহুদিনের বহু ধরনের বিচিত্র মানুষের মধ্যে

লিবিডোর খেলা দেখে অবশেষে যখন কুসুম গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার কথা শুনল তখন তার মনের উপর থেকে বিরূপতার আবরণ সরে গেল। শশীর স্পষ্টই বুঝলো সমাজে অবৈধ হলেও তার মন নিজের অজ্ঞাতসারে কুসুমের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। ততদিনে অন্য মানুষ কোথায় অপ্রচলিত শক্তির ভালোবাসা নিজের অন্তরের অপূর্ব অচেনা ভাবের মুখোমুখি এসে সে বুঝতে পারল সে একটা অবচেতনে ক্রিয়া-কলাপ কেমন অনিবার্য। সুতরাং সমস্ত সঙ্কোচ বিসর্জন দিয়ে যখন সে তার কাছে আসার প্রস্তাব দিল কুসুমকে তার অদ্ভুত হাস্যকর তা তখনই শশীর কাছে ধরা পরল না। প্রত্যাখ্যাত সুশীল কাছে অবচেতনের অবদমিত ভাব গুলির উপর চেতন মনে অধিকার যে কত তার উপলব্ধি শশীর সত্ত্বায় দেহ-মনে যে অবসাদের ক্লান্তি নিয়ে এলো এই উপন্যাসটি শেষ হয়েছে শশীর আত্মিক মৃত্যুর বর্ণনা।

অর্থাৎ গাওদিয়া গ্রামে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে কুসুমের বাবা অনন্তর মতো অনেকেরই মনে হয়েছে তা নিয়তির খেলা। আসলে তা প্রতিটি মানুষেরই দ্বৈত সত্তার দ্বান্দ্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। সুশীল পিতা গোপাল তার বোন বিন্দুবাসিনী কে জোর করে বিয়ে দিয়েছিল নন্দলালের সঙ্গে।চেয়েছিল বিন্দুকে সুখী করতে। কিন্তু ফল দাঁড়িয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত। নন্দী স্ত্রী বিন্দু কলকাতার বাড়িতে রক্ষিতার অস্বাভাবিক জীবন যাপন করেছে। বিকৃত জীবন থেকে মুক্তির আশায় তাকে গাওদিয়া ফিরিয়ে এনেছিল শশী। কিন্তু ততদিনে রক্ষিতার উগ্র জীবন-যাপনে অভ্যস্ত বিন্দুর অবচেতন আকাঙ্ক্ষা সুস্থ জীবনযাপন আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত করেছিল। ফলে বিন্দুকে নন্দলালের কলকাতার বাড়িতে শশী ফিরিয়ে দিয়ে এসেছিল। জয়া ও তার শিল্পী স্বামী বনবিহারী ভালবেসে বিয়ে করেছিল। অথচ দেখা গেল ক্রমেই আশা-আকাঙ্ক্ষা মানসিকতার মধ্যে বিরোধ যা তাদের স্বচ্ছন্দ জীবনে ছন্দহীন বিকার এনে দিয়েছে। অর্থাৎ জীবনে যেখানে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন সেখানেই সেইসব অসঙ্গতির মূলে আছে মানুষের দ্বৈত সত্তার সঠিক দিক নির্ণয় সম্ভব প্রায়ই হয় না। যাদব পন্ডিত জীবনকে ভালোবেসেছেন তীব্রভাবে অন্ধকারে সাপের কামড়ে ভয় লাঠি ঠুকে ঠুকে পথ চলেছে অথচ জীবনে গৌরবান্বিত প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য জীবনকে মৃত্যুর হাতে উপহার

দিয়েছেন। যামিনী কবিরাজ মৃত্যুর সঙ্গে নিজের মত করে যুদ্ধ করেছেন কিন্তু স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ শশীর প্রতি আক্রোশে মৃত্যুকেই প্রায় ডেকে এনেছে। কিন্তু তার বিলম্বিত জীবনে শূন্যতাকে ডাকতে চেয়েও পারেনি। সুশীল পিতা গোপাল বৈষয়িক মানুষ। কিন্তু তার মধ্যেও রয়েছে পিতৃ হৃদয়ের স্নেহের ফল্গুধারা। গোপাল চেয়েছিল শশী গ্রামে থাকুক এবং তার সম্পত্তি ভোগ করুক। কিন্তু শশীর গাওদিয়া আর সংকীর্ণ পরিমণ্ডল থেকে মুক্তি চেয়েছে বারবার। শেষ পর্যন্ত গোপাল কাশি যাত্রা করেছে ফলে গোপালের শশীকে একান্ত করে কাছে পাওয়ার আশা যেমন চরিতার্থ হয়নি তেমনি অপরদিকে শশী ও গোপালের ষড়যন্ত্রে আটকে পড়ে গেছে এই গাওদিয়া সংকীর্ণতাতেই।

এইভাবে অপমৃত্যু ঘটে গেছে জীবনের বহু আশা-আকাঙ্খার। মানুষদের সচেতন মনের দ্বারা চালিত নয় অবচেতনের ক্রিয়ায় চালিত।তার জন্ম মৃত্যু এই দুই সুতোর টানাপোড়েনে সংঘটিত পুতুল নাচের ইতিকথা উপন্যাসের চরিত্রগুলো অজানা অমোঘ মৃত্যুর টানেই নয়,উল্টো দিকে আছে জানা বাস্তব জীবনের অন্তরালে অজানা অবচেতনের বিপরীতমুখী সুতোর টান।

১০.৩ মূল কাহিনী ও উপকাহিনীর যোগসুত্র

পুতুল নাচের ইতিকথা উপন্যাস লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গাওদিয়া গ্রাম জীবনের চিত্রাংকন করেছেন। সেই সূত্রে তার উপন্যাসে উঠে এসেছে বিভিন্ন চরিত্র এবং সেইসব চরিত্রদের জীবন কাহিনী।

যেকোনো উপন্যাসেই প্রধান চরিত্র সাথে গৌণ চরিত্র সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তেমন ভাবে প্রধান চরিত্র দের নিয়ে যে কাহিনী উপন্যাসের রচিত হয় সেই কাহিনীর পাশাপাশি গৌণ চরিত্রদের নিয়েও সমান্তরালভাবে আরো এক কাহিনী লেখক রচনা করেন। যা প্রধান কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমান্তরালভাবে এগিয়ে চলে এবং মূল কাহিনীর সঙ্গে গৌণ কাহিনীর একটি বিন্দুতে যোগসুত্র রচিত হয়।এই উপন্যাসের ক্ষেত্রেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দুটি কাহিনী রচনা করেছেন।একই সাথে একটি মূল কাহিনী যার নায়ক শশী এবং নায়িকা কুসুম। পাশাপাশি একটি উপকাহিনী ও রচনা

করেছেন যার নায়ক কুমুদ এবং নায়িকা মতি।এখানে মূল কাহিনী হলো শশী কুসুম এর প্রসঙ্গ। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শশী । উপন্যাসের একদম গোড়ায় তার সাথে দেখা হয় হারু ঘোষের । কিন্তু হারু জীবিত নয় , বজ্রাঘাতে তার মৃত্যু হয়েছে । এভাবে হারু ঘোষের প্রসঙ্গে প্রথম উন্মোচিত হয় গল্পের নায়কের পর্দা , শশীকে চিনতে শুরু করে পাঠক ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার পুতুল নাচের ইতিকথা উপন্যাসে কুসুম চরিত্রের অঙ্কন করেছেন এক জটিল এবং অতলান্তিক গভীরতার মধ্য দিয়ে । কুসুম এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র এবং শশী ডাক্তারের সাথে তার সম্পর্কের অদ্ভুত উত্থান এবং পতন এই গোটা উপন্যাস জুড়ে পাঠকের মনস্তত্বে এক গভীর প্রভাব রেখে যেতে সমর্থ হয় ।

এই উপন্যাসে কুসুমের আবির্ভাব ভীষণ অনাড়ম্বর ভাবে , শশী ডাক্তার পরাণের বাড়িতে যায় মতিকে পরীক্ষা করতে, সেই সময়ে লেখক লিখছেন – ‘কুসুম গিয়াছিল ঘাটে’ । সেই প্রথম উপন্যাসে কুসুমের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এটি । কুসুম এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র হলেও তার পরে গোটা সময় জুড়ে কুসুমের যে গভীর মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ চলবে তার কোনো আভাস উনি দেননি শুরুতে । ভীষণ নির্লিপ্তভাবে কুসুমের উপস্থিতি বর্ণনা করেন লেখক ।

কুসুমের এই নির্লিপ্ত স্বভাব আমরা গোটা উপন্যাসেই দেখতে পাই । সে অনায়াসে শশী ডাক্তারের সখের গোলাপ চারা পায়ে মাড়িয়ে দিতে পারে বার বার । সে কোন অছিলায় কাছে আস্তে পারে শশীর । কুসুমের কোন ভান নেই, কোন অবরন নেই । এহেন আবরণহীনা কুসুম প্রথম থেকেই বিভিন্নভাবে শশীকে জানিয়েছে তার মনের কথা । কখনও মতির নামে মিথ্যে কথা বলে সে শশীর সাথে কথা বলতে চেয়েছে কিছু বেশী । কখনও সে কুমুদকে বলেছে ‘ ছোটবাবু আমাদের বলতে গেলে একরকম আপনার লোক, দুবেলা আসেন ।’ কখনও আবার কুসুম শশীকে চরম অপমান করে ।

শশী এবং কুসুমের এই সম্পর্ক নানা দ্বিধা এবং দ্বন্দ্বের জটিলতায় পরিপূর্ণ । কুসুম কখনও নিজ কামনায় আকুল হয়ে আছড়ে পড়ে , আবার শশী কখনও সমাজ এবং নিজ মনস্তাত্ত্বিক দ্বিধার শঙ্কায় জীর্ণ ।

কুসুমের চরিত্রের অন্যতম প্রধান দিক হল তার স্পষ্ট ভাষা । সে শশীর বাড়ি যায় পেটে ব্যাথার মিথ্যে অজুহাতে এবং গিয়ে শশীর সাথে গোলাপ চারা মাড়িয়ে দিয়ে তার সহজাত নির্লিপ্ত বদনে বলে 'ইচ্ছে করেই দিয়েছি ছোটবাবু । চারার জন্য এত মায়া কেন?' শশীর ভালোবাসার চারাগাছ মাড়িয়ে সে প্রমাণ করতে চায় যে ওই গোলাপচারার মধ্যে শশী কি এমন দেখতে পায় যা কুসুমের মধ্যে নেই? যে ভালোবাসা শশী ওই গোলাপচারাকে দেয় সেই ভালোবাসা আসলে তো কুসুমেরই প্রাপ্য । এই স্পষ্ট কথা কুসুম ব্যাক্ত করে তার এই ছোট কাজের মধ্য দিয়ে ।

কুসুম যেহেতু পরাণের সঙ্গে বিবাহ সুত্রে আবদ্ধ সেই কারনে পরাণের চরিত্রও সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে । পরাণের প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন- 'পরাণ সব বিষয়ে উদাসীন । সন্ধ্যার আবির্ভাবে তাহার বোন আর বৌ যত ব্যাস্ত হইয়া ওঠে, সে যেন ততই ঝিমাইয়া যায় । রান্নাঘরে বসিয়া কুসুমের সঙ্গে সে প্রথম একটু গল্প জমাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। গল্প করিবার সময় না থাকায় কুসুম তাহাকে আমল দেয় নাই; দাওয়ায় বসে হুঁকা টানগে না বাপু? মেয়ে-মানুষের আঁচল ধরা পুরুষকে আমি দুচোখে দেখতে পাড়ি না ।- কুসুমের ভর্ৎসনায় চিরকাল পরাণের খারাপ লাগে । তবে স্পষ্ট খারাপ লাগার ভাবনা এত অল্প সময়ের মধ্যে মনের একটা উদাস বৈরাগ্য ও দেহের একটা ঝিমানো আলস্যে পরিণত হইয়া যায় যে, রাগিবার অবসর প্রায়ই সে পায় না ।' পরাণের সাথে তার স্ত্রী কুসুমের মনের বিস্তর ফারাক । এই ফারাকের পরিখা পেরিয়ে কিছুতেই ঝাঁঝালো কুসুমের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না পরাণের উদাস এবং আলস্যে ভরা মন । তাই কুসুমের অন্তর রয়ে যায় অন্তর্নিহিত এবং সম্পর্ক থেকে যায় শুধুমাত্র সামাজিক পরিচয়ে ।

কুসুমের এই মনোবৃত্তি জটিল এবং গভীর । কুসুম তার যুবতী শরীর বিষয়ে সচেতন এবং এই বিষয়ে সে মতিকেও ঈর্ষা করে । যাত্রাপালা দেখতে যাওয়ার আগের মুহূর্তে ‘মতির হাল্কা অপরিণত দেহটিকে কুসুম হিংসা করে । মনে হয় তাহার নিজের স্বাস্থ্য এতখানি ভালো না হইলেই যেন সে খুশি হইত’ মতিকে সে ঈর্ষা করতে থাকে কারন শশী ডাক্তার মতিকে ভালোভাবে পরীক্ষা করলেও তাকে পরীক্ষা করেনা । ‘কানে নল লাগাইয়া শশী মতির বুকটা পরীক্ষা করিয়া দেখিল, নিঃশব্দ পদে কুসুম পেছনে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে, বুকে ওর হয়েছে কি? অত পরীক্ষে কিসের?’ কুসুম নিজের পেটে ব্যাথার অছিলায় শশী ডাক্তারকে বাড়িতে ডেকে আনে এবং ডেকে এনে তাকে পরীক্ষা করতে বলে । কুসুম বলে তার পেটে ব্যাথা হয়েছে। মাঝরাতে বিরক্ত হয় শশী, সে বলে ‘পেটের ব্যাথাটা বড় রহস্যময় অসুখ’ কিন্তু তবু কুসুম মিথ্যে বলে শশীকে , সে বলে সে ওষুধ খেয়েছে তবু তার ব্যাথা কমেনি । এই কথা শুনে শশী বলে এটি সে বাড়াবাড়ি করছে । কুসুম বলে ‘কী আছে? বাড়াবাড়ি? হ্যাঁগো ছোটবাবু , আছেই তো । তা যাই বলেন। এক ঘণ্টা ধরে বুক পরীক্ষা ম্যালেরিয়া জ্বর হলে, আমি করি না’ এই কোথায় শশী বিব্রত হয়, কুসুম তাই চায় , সে চায় নানা অছিলায় শশীকে বিব্রত করতে এবং সে কথার মাঝে শশীকে অপমান করতে ছাড়ে না।

একদিকে যেমন কুসুম বিব্রত করে তোলে শশীকে অপরদিকে দুজনেই দুজনের প্রতি উদ্বিগ্ন । এ কথা বুঝতে পারা যায় বিভিন্ন ঘটনায় । শশী আসে কুসুমের জিভ পরীক্ষা করতে এবং সে কুসুমের জিভ দেখে ‘ না জিভ অপরিষ্কার থাকার কোন কারন নাই । কুসুমের স্বাস্থ্য বাহিরের ফাঁকি নয়, ভিতরেও সে খুব মজবুত । কুসুমকে শশীর এইজন্যই ভালো লাগে।’

এই কোথায় যেমন বোঝা যায় শশী ডাক্তার কুসুমের প্রতি উদ্বিগ্ন ঠিক তেমনই আরেকটি ঘটনায় এই একই মানসিক প্রবৃত্তি ফুটে ওঠে কুসুমের থেকে । যাদব পণ্ডিতকে নিয়ে শশী যখন খানিক বিব্রত তখন কুসুম এসে জানতে চায় তার এমন মুখের কারন কি । সে বলে তার মুখ কেন এত শুকনো লাগছে, কথার উত্তরে বিরক্তি প্রকাশ করে শশী জানায় তার মন ভালো নেই এবং এর থেকে বেশী কৈফিয়ত সে

তাকে দিতে পারবেনা । এই কথায় রুষ্ট হয়ে কুসুম বলে ‘কৈফিয়ত কেউ চায়নি আপনার কাছে। মুখ শুকনো দেখে মায়া হল, তাই জানতে এলাম অসুখ - বিসুখ হয়েছে নাকি । সংসারে জানেন ছোটোবাবু, যেচে মায়া করতে গেলে পদে পদে অপমান হতে হয় ।’

এই কোথায় কুসুমের শশীর প্রতি অভিমান ফুটে ওঠে । এর থেকে আরেকটি বিষয়ও বোঝা যায় সে সে শশীর প্রতি যতটা যত্নশীল, তা সে পরাণের প্রতি নয় । কারন পরাণের সাথে তার এই ধরনের কোন কথোপকথন পাঠক দেখতে পাননা এই উপন্যাসে ।

শশী এবং কুসুমের ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই বাড়তে থাকে এবং তা শশীর চিন্তার কারন হয়ে দাঁড়ায় । আগেই বোঝা গেছে কুসুম যেমন সহজ এবং সাবলীল এই প্রকাশের বিষয়ে শশী তা নয় । তাই শশী বলে ‘আমরা ছেলেমানুষ নই, ইচ্ছে হলেই একটা কাজ কি আমরা করতে পারি? বুঝেসুঝে কাজ করা দরকার । একে তো দ্যাখো পরান আমার বন্ধু, উপকার করতে গিয়ে চিরকাল ওর অপকারই করেছি ।’ এই কোথায় শশীর কুসুমের প্রতি এবং সর্বোপরি তার সংসারের প্রতি এক গভীর উদ্বেগ পরিলক্ষিত হয়।

যখন কুসুম বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার জন্য রওনা দিলে শশী বাজিতপুর যাবে বলে আসে এবং তার সাথে দেখা হয় । কুসুম ভীষণ সন্তর্পণে একবার তার বাপের দিকে তাকিয়ে নেয় এবং শশীকে জিজ্ঞাসা করে ‘আমার জন্য এলেন আজ’ , শশী তার উত্তরে হ্যাঁ বলেন এবং এতে কুসুমের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । এই উজ্জ্বলতাই হয়তো শশী এবং কুসুমের অন্তরের প্রেমের আখ্যান সঠিকভাবে বর্ণনা করতে পারে ।

অনেক দিন পড়ে যখন অনেক সময় কেটে গেছে এবং শশী ক্রমাগত দূরে সরিয়ে গেছে কুসুমকে , এক সময়ে এসে শশী নিজের কাছে হেরে যায় এবং একা হয়ে পড়ে।

শশী তার হাত ধরে বলে ‘আমার সাথে চলে যাবে বৌ?’ কুসুম রাজি হয়নি । সে বলেছে ‘তা যেতাম ছোটবাবু । স্পষ্ট করে ডাকা দূরে থাক, ইশারা করে ডাকলেও ছুটে

যেতাম । চিরদিন কি একরকম যায়? মানুষ কি লোহার গড়া , যে চিরকাল সে একরকম থাকবে । বদলাবে না ? বলতে বসেছি যখন কড়া করেই বলি, আজ হাত ধরে টানলেও আমি যাবো না ।' তার তীব্র ইচ্ছে ছিল একসময় , কিন্তু আজ তা নেই , তাই আজ তার কোন ইচ্ছে নেই যাওয়ার । সে যেমন তার আকাঙ্খার কথা শশীকে সরাসরি জানিয়েছে , দ্বিধাহীন ভাবে জানিয়েছে ঠিক তেমনই জকজন যাওয়ার সময় তখন সে কিছুতেই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েনা , বরং সে সোজাভাবে মুখে উপর শশীকে প্রত্যাখান করে । তাই সে বলে ' লাল টকটকে করে তাতান লোহা ফেলে রাখলে টাও আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে যায় । যায় না?... কাকে ডাকছেন ছোটবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে?কুসুম কি বেঁচে আছে?সে মরে গেছে ।'

শশী কুসুমের প্রসঙ্গে সঙ্গেই সমান্তরালভাবে এগিয়ে চলেছে কুমুদ মতির কাহিনী। মতি সম্পর্কে কুমুসের ননদ। কুসুমের মধ্য দিয়েই মতি ও কুমুদের কাহিনী মূল কাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়।

পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসের সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে কুসুম এবং শশীর প্রেমের আখ্যান । তার পাশাপাশি এই উপন্যাসের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে কুমুদ এবং মতির ভালোবাসার গল্প ।

মতি পরাণের বোন এবং এই উপন্যাসের সুত্রপাত তাকে দিয়েই, তার পিতা অর্থাৎ হারু ঘোষের মৃত্যুই এই উপন্যাসের সুত্রপাত করে । মতির চেহারার বিশেষ উল্লেখ এই উপন্যাসে করেছেন লেখক । তিনি লিখেছেম ' রসালো ফলের মতো কোমল রং যে মতির, প্রতিমার মতো অমন নিখুঁত মুখ' এই সব সত্তেও মতি অপরিচ্ছন্ন থাকে, শশী তার চিকিৎসা করতে এসে সাবান না মাখা নিয়ে তাকে বলে । শশীর দ্বিধাগ্রস্ত মন কখনই স্থির করতে পারেনা কিছুতে । তাই মতির প্রতি তার দুর্বলতাও বোঝা যায়না সহজে । মতি তাল পুকুরের নির্জন প্রান্তে বসে তার সুখী সংসারের স্বপ্ন দেখে- 'মতির ভারী ইচ্ছা, বড়লোকের বাড়িতে শশীর মত বরের সঙ্গে তার বিবাহ হয় । কাজ নাই, বকুনি নাই, কলহ নাই, নোংরামি নাই, বাড়ির সকলে

সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে । মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে হাসে, তাসপাশা খেলে,কলের গান বাজায় আর –বাড়ির বৌকে খালি আদর করে ।

কুমুদ যাত্রাপালায় অভিনয় করতে গ্রামে আসে এবং শশীর বাড়িতে এসে থাকে । এই সময় তালপুকুরের ধারে সে যায় এবং রবারের একটি জিনিস তার পায়ে ঠেকে, সে তাকিয়ে দেখে সেটি একটি সাপ এবং সেই সাপ তার পায়ে হাঁটুর কাছে কামড়েছে । শুধু কামড়ায়নি বরং তার লেজের পিছন দিয়ে তার পা জড়িয়ে ধরে আছে । এই দৃশ্য দেখে কুমুদ যারপরনাই ভয় পেয়ে যায় এবং তার ধারনা হয় যে সাপটি বিষাক্ত এবং এই সাপের বিষ তার প্রাণ নিয়ে নেবে । ঠিক এমন সময় আতঙ্কগ্রস্ত কুমুদের সামনে এসে উপস্থিত হন মতি । মতি কুমুদকে বলে যে এই সাপ বিষাক্ত নয় এবং এটি তার প্রাণ নেবেনা । এই সাপের বিষ নেই । এই কথা শুনে কুমুদ আস্বস্ত হয় এবং দেহে প্রাণ ফিরে পায় । কুমুদের সাথে মতির এই বন্ধন যেন চিরতরের । যে কুমুদ কোনদিন এক জায়গায় থিতু হয়নি, বরাবর যাযাবরের মত জীবন কাটিয়েছে তার সামনে কি এমন হলো যে সে তার বোহেমিয়ান ছেড়ে দিয়ে সংসার করার কথা চিন্তা করতে লাগলো ।

মতির কাছে এ ভীষণ আশ্চর্যের সময়। যা সে চিরকাল চেয়ে এসেছে , যা সে চেয়েছে শশী ডাক্তারের কাছে, যা সে পায়নি , আচমকাই কোন পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই তা মতির সামনে উপস্থিত । মতি মোহিত হয়ে যায় কুমুদের সামনে । যাত্রাপালা দেখতে যাওয়ার জন্য তার অসীম আগ্রহ তৈরি হয় । যাত্রার আসরে এসে মতি দেখে প্রচুর আলো, এত আলো সে আগে কখনও দেখেনি, এত শব্দ একসাথে সে আগে কখনও শোনেনি , এত মানুষের সমাগম, তার কেন্দ্রে কুমুদ , এত কিছুর মধ্যে সে কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে । প্রবীরের চরিত্রে কুমুদ প্রবেশ করা মাত্র তার উত্তেজনা যেন কয়েক গুন বেড়ে যায় । প্রবীরের সংলাপে সে যখন বলে – ‘রাগ করিয়াছ? কেন রাগ করিয়াছ অবোধ বালিকা? কেন এত অভিমান । দুটি চোখে , কেন এত ভর্ৎসনা?’ তখন মতির বুকের ভিতরে কেউ যেন ডেকে ওঠে, তার হৃদয় যেন শিরশির করে ওঠে ।

কুমুদের সঙ্গে মতির এই ভালোবাসার অধ্যায় আপাতভাবে শেষ করে কুমুদ চলে যায় কলকাতায় , মতিও কয়েকদিন পর শশীকে বলে তাকে কলকাতা ঘুরতে নিয়ে যেতে । শুধু মতি নয়, সঙ্গে যায় কুসুম এবং পরান । তবে মতির যে আগ্রহে কলকাতা যাওয়া, অর্থাৎ কুমুদকে খুঁজতে, তার দেখা পেতে এবং তার অসম্পূর্ণ ভালোবাসা সম্পূর্ণ করতে তা সে করতে পারেনা কারন সে কুমুদের দেখা পায়না ।ব্যর্থ মনোরথে মতি ফিরে আসে গাওদিয়ায় । তার কয়েকদিন পরেই কুমুদ নিজে গাওদিয়ায় আসে এবং তালপুকুরের ধারে তাদের সাক্ষাত হয়, সেখানে কুমুদ মতিকে প্রেম নিবেদন করে এবং জানায় যে সে মতিকে বিয়ে করে কলকাতা নিয়ে যেতেই গাওদিয়ায় ফিরে এসেছে । মতির স্বপ্ন পুরন হয় । মতি যে তালপুকুরের সামনে বসে তার সুখী সংসারের স্বপ্ন দেখেছিল সেখানে এসেই কুমুদ যেন তার স্বপ্ন পূরণ করে । মতি অবশেষে কুমুদকে বিয়ে করে কলকাতা পাড়ি দেয় কুমুদের সাথে ।

মতির কলকাতা যাত্রার পর কেটে যায় অনেকদিন, এর মাঝে কোন খবর পাওয়া যায়না মতির । উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদে আবার মতির কথা জানতে পারে পাঠক । জানতে পারা যায় যে মতি এবং কুমুদ তাদের সংসার শুরু করে একটি হোটেলে । সেখানে তাঁরা কোনোভাবে থাকে এবং অভিনব কায়দায় জীবন চালায় । শহুরে জীবনযাপন অচেনা ঠেকে মতির কাছে , সে প্রথম থাকছে এই শহরে । এর আগে সে বেড়াতে এসেছে শুধুমাত্র । বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাথে পরিচয় হয় মতির এই হোটেলে । দিন বাড়তে থাকে এবং হোটেলে কুমুদের বন্ধুদের আনাগোনাও বাড়তে থাকে । এই বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই মতিরও বন্ধু হয়ে যায় । মতি এই ধরনের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত নয় । ঘরে তাস খেলা চলে , জুয়া খেলা চলে , মতির ভাললাগেনা, কান্না আসে । মতির দায়িত্ব শুধু চা করা । মতি ভাবে ‘কলের মত একহাতে কুমুদের পা টিপিতে অন্যহাতে তাকে চোখ মুছিয়া ফেলিতে হয় । নিজেকে কেমন বন্দিনী মনে হয় মতির । মনে হয়, কুমুদ তাকে চিরকাল এই ছোট ঘরটিতে পা টেপানোর জন্য আতকাইয়া রাখিবে, তাহার খেলার সাথী কেহ থাকিবে না, মাঠ ও আকাশ আর জীবনে পড়িবে না চোখে, বালি মাটির নরম গেঁয়ো পথে আর সে পারিবেনা হাঁটিতে ।’

মতি এবং কুমুদ এরপর উঠে যায় অন্য একটি ভাড়া বাড়িতে, যেখানে তাদের সঙ্গী হন জয়া এবং বনবিহারী । কুমুদের সাথে জয়ার সখ্য দেখে মতি যারপরনাই ঈর্ষান্বিত হয়। এরপর জয়ার সাথে সমস্যার কারনে তাদের উঠে যেতে হয় । শশী এবং পরাণ মতিকে বাড়ি নিয়ে যেতে গেলে মতি কৌশলে তাদের সাথে না গিয়ে কুমুদের সাথেই যাত্রাপালার দলে চলে যায় এবং মতিও এই বোহেমিয়ান জীবনের নেশায় আকৃষ্ট হয়ে সেই স্বপ্নের জগতে ডুব দেয় দেয় ।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১. পুতুল নাচের ইতিকথা উপন্যাস কুসুমের আবির্ভাব কিভাবে হয়?

উত্তর-এই উপন্যাসে কুসুমের আবির্ভাব ভীষণ অনাড়ম্বর ভাবে , শশী ডাক্তার পরাণের বাড়িতে যায় মতিকে পরীক্ষা করতে, সেই সময়ে লেখক লিখছেন – ‘কুসুম গিয়াছিল ঘাটে’ । সেই প্রথম উপন্যাসে কুমুমের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এটি । কুসুম এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র হলেও তার পরে গোটা সময় জুড়ে কুসুমের যে গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ চলবে তার কোনো আভাস উনি দেননি শুরুতে । ভীষণ নির্লিপ্তভাবে কুসুমের উপস্থিতি বর্ণনা করেন লেখক।

২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়তি সম্পর্কে কী বলেছেন?

উত্তর-পরবর্তীকালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়তির অদৃশ্য সুতোর টানের কথা স্বীকার না করে বলেছেন উপন্যাসের চরিত্রগুলো যে পুতুল নাচের মতোই নেচে চলেছে তার প্রেক্ষাপটে আছে মানুষেরই বাস্তব সমাজে নানা শক্তির সংঘাত ও চরিত্র গুলির পরস্পর বিরোধী আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব।অর্থাৎ এই উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের যে পরিণতি ঘটেছে তার দায় সেই সব চরিত্রগুলির নিজেদেরই,কোনো অলৌকিক নিয়তির শক্তি নয়।

১০.৪ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১.'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে মৃত্যুচেতনা কিভাবে উপন্যাসকে ত্বরান্বিত করেছে লেখ।

২.'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে নায়িকা কুসুমের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩.'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাস মূল কাহিনী ও গৌণ কাহিনী কিভাবে মিলিত হয়েছে লেখ।

১০.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়--- নিতাই বসু

২. বক্তব্য---ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

৩. নিয়তিবাদ উদ্ভব ও বিকাশ--- সুকুমারী ভট্টাচার্য।

একক ১১ পুতুল নাচের ইতিকথা- কুমুদ মতি উপাখ্যান

বিন্যাসক্রম

১১.১ কুমুদ মতি উপাখ্যান

১১.২ শশীর নিঃসঙ্গ মনস্তত্ত্ব বিচার

১১.৩ গল্পের নায়ক শশী এবং নায়িকা কুসুম এই বক্তব্যের যথার্থতা।

১১.৪ ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব উপন্যাসের নায়িকা কুসুমের চালিকাশক্তি।

১১.৫ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১১.১ কুমুদ মতি উপাখ্যান

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসের সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে কুসুম এবং শশীর প্রেমের আখ্যান । তার পাশাপাশি এই উপন্যাসের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে কুমুদ এবং মতির ভালোবাসার গল্প ।

মতি পরাণের বোন এবং এই উপন্যাসের সুত্রপাত তাকে দিয়েইতার পিতা অর্থাৎ , হারু ঘোষের মৃত্যুই এই উপন্যাসের সুত্রপাত করে । মতির চেহারার বিশেষ উল্লেখ রসালো ফলের মতো কোমল রং ‘ এই উপন্যাসে করেছেন লেখক । তিনি লিখেছেম এই সব সত্তেও ’প্রতিমার মতো অমন নিখুঁত মুখ ,যে মতির মতি অপরিচ্ছন্ন থাকে , শশী তার চিকিৎসা করতে এসে সাবান না মাখা নিয়ে তাকে বলে । শশীর দ্বিধাগ্রস্ত

মন কখনই স্থির করতে পারেনা কিছুতে । তাই মতির প্রতি তার দুর্বলতাও বোঝা যায়না সহজে । মতি তাল পুকুরের নির্জন প্রান্তে বসে তার সুখী সংসারের স্বপ্ন দেখে মতির ভারী ই‘ –চ্ছাবড়লোকের বাড়িতে শশীর মত বরের সঙ্গে তার বিবাহ হয় । , বাড়ির সকলে সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ,নংরামি নাই ,কলহ নাই ,বকুনি নাই ,কাজ নাই বাড়ির – কলের গান বাজায় আর,তাসপাশা খেলে ,থাকে । মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে হাসে বৌকে খালি আদর করে ।

কুমুদ যাত্রাপালায় অভিনয় করতে গ্রামে আসে এবং শশীর বাড়িতে এসে থাকে । এই সময় তালপুকুরের ধারে সে যায় এবং রবারের একটি জিনিস তার পায়ে ঠেকেসে , তাকিয়ে দেখে সেটি একটি সাপ এবং সেই সাপ তার পায়ে হাঁটুর কাছে কামড়েছে । সুধু কামড়ায়নি বরং তার লেজের পিছন দিয়ে তার পা জড়িয়ে ধরে আছে । এই দৃশ্য দেখে কুমুদ যারপরনাই ভয় পেয়ে যায় এবং তার ধারনা হয় যে সাপটি বিশাক্ত এবং এই সাপের বিষ তার প্রাণ নিয়ে নেবে । ঠিক এমন সময় আতঙ্কগ্রস্ত কুমুদের সামনে এসে উপস্থিত হন মতি । মতি কুমুদকে বলে যে এই সাপ বিশাক্ত নয় এবং এটি তার প্রাণ নেবেনা । এই সাপের বিষ নেই । এই কথা শুনে কুমুদ আস্বস্ত হয় এবং দেহে প্রাণ ফিরে পায় । কুমুদের সাথে মতির এই বন্ধন যেন চিরতরের । যে কুমুদ কোনদিন এক জায়গায় থিতু হয়নিবরাবর জাজাবরের মত জীবন কাতিয়েছে তার , সামনে কি এমন হলো যে সে তার বোহেমিয়ান ছেড়ে দিয়ে সংসার করার কথা চিন্তা করতে লাগলো ।

মতির কাছে এ ভীষণ আশ্চর্যের সময়। যা সে চিরকাল চেয়ে এসেছে যা সে চেয়েছে , আচমকাই কোন পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই তা মতির , যা সে পায়নি ,শশী ডাক্তারের কাছে সামনে উপস্থিত । মতি মোহিত হয়ে যায় কুমুদের সামনে । যাত্রাপালা দেখতে যাওয়ার জন্য তার অসীম আগ্রহ তৈরি হয় । যাত্রার আসরে এসে মতি দেখে প্রচুর আলো , , এত শব্দ একসাথে সে আগে কখনও শোনেনি ,এত আলো সে আগে কখনও দেখেনি এত কিছুর মধ্যে সে কেমন আচ্ছন্ন হয়ে , তার কেন্দ্রে কুমুদ ,এত মানুষের সমাগম পড়ে । প্রবীরের চরিত্রে কুমুদ প্রবেশ করা মাত্র তার উত্তেজনা যেন কয়েক গুন বেড়ে

কেন রাগ করিয়াছ অবোধ ?রাগ করিয়াছ' – যায় । প্রবীরের সংলাপে সে যখন বলে কেন এত , কেন এত অভিমান । দুটি চোখে ?বালিকাভর্ৎসনা?' তখন মতির বুকের ভিতরে কেউ যেন ডেকে ওঠে, তার হৃদয় যেন শিরশির করে ওঠে ।

কুমুদের সঙ্গে মতির এই ভালোবাসার অধ্যায় আপাতভাবে শেষ করে কুমুদ চলে যায় কলকাতায় , মতিও কয়েকদিন পর শশীকে বলে তাকে কলকাতা ঘুরতে নিয়ে যেতে । শুধু মতি নয়, সঙ্গে যায় কুসুম এবং পরান । তবে মতির যে আগ্রহে কলকাতা যাওয়া, অর্থাৎ কুমুদকে খুঁজতে, তার দেখা পেতে এবং তার অসম্পূর্ণ ভালোবাসা সম্পূর্ণ করতে তা সে করতে পারেনা কারন সে কুমুদের দেখা পায়না ।ব্যর্থ মনোরথে মতি ফিরে আসে গাওদিয়ায় । তার কয়েকদিন পরেই কুমুদ নিজে গাওদিয়ায় আসে এবং তালপুকুরের ধারে তাদের সাক্ষাত হয়, সেখানে কুমুদ মতিকে প্রেম নিবেদন করে এবং জানায় যে সে মতিকে বিয়ে করে কলকাতা নিয়ে যেতেই গাওদিয়ায় ফিরে এসেছে । মতির স্বপ্ন পুরন হয় । মতি যে তালপুকুরের সামনে বসে তার সুখী সংসারের স্বপ্ন দেখেছিল সেখানে এসেই কুমুদ যেন তার স্বপ্ন পূরণ করে । মতি অবশেষে কুমুদকে বিয়ে করে কলকাতা পাড়ি দেয় কুমুদের সাথে ।

মতির কলকাতা যাত্রার পর কেটে যায় অনেকদিনএর মাঝে কোন খবর পাওয়া , যায়না মতির । উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদে আবার মতির কথা জানতে পারে পাঠক । জানতে পারা যায় যে মতি এবং কুমুদ তাদের সংসার শুরু করে একটি হোটেলে । সেখানে তাঁরা কোনোভাবে থাকে এবং অভিনব কায়দায় জীবন চালায় । শহুরে জীবনযাপন অছেনা ঠেকে মতির কাছে সে প্রথম থাকছে এই শহরে । এর আগে , সে বেড়াতে এসেছে শুধুমাত্র । বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাথে পরিচয় হয় মতির এই হোটেলে । দিন বারতে থাকে এবং হোটেলে কুমুদের বন্ধুদের আনাগোনাও বারতে থাকে । এই বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই মতিরও বন্ধু হয়ে যায় । মতি এই ধরনের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত নয় । ঘরে তাস খেলা চলে , জুয়া খেলা চলে মতির , কলের মত ' কান্না আসে । মতির দায়িত্ব শুধু চা করা । মতি ভাবে ,ভাললাগেনা একহাতে কুমুদের পা টিপিতে অন্যহাতে তাকে চোখ মুছিয়া ফেলিতে হয় । নিজেকে

কুমুদ তাকে চিরকাল এই ছোট ঘরটিতে পা ,কেমন বন্দিনী মনে হয় মতির । মনে হয় তাহার খেলার সাথী কেহ থাকিবে ,টেপানোর জন্য আতকাইয়া রাখিবেনামাঠ ও , বালি মাটির নরম গেঁয়ো পথে আর সে ,আকাশ আর জীবনে পড়িবে না চোখে 'পারিবেনা হাঁটিতে ।

মতি এবং কুমুদ এরপর উঠে যায় অন্য একটি ভাড়া বাড়িতেযেখানে তাদের সঙ্গী , হন জয়া এবং বনবিহারী । কুমুদের সাথে জয়ার সখ্যদেখে মতি যারপরনাই ঈর্ষান্বিত হয়। এরপর জয়ার সাথে সমস্যার কারনে তাদের উঠে যেতে হয় । শশী এবং পরাণ মতিকে বাড়ি নিয়ে যেতে গেলে মতি কৌশলে তাদের সাথে না গিয়ে কুমুদের সাথেই যাত্রাপালার দলে চলে যায় এবং মতিও এই বোহেমিয়ান জীবনের নেশায় আকৃষ্ট হয়ে সেই স্বপ্নের জগতে ডুব দেয় দেয় ।

১১.২ শশীর নিঃসঙ্গ মনস্তত্ত্ব

শশীর চরিত্রে দুটি সুস্পষ্ট ভাগ করেছেন লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় । একদিকে যেমন সে কল্পনাপ্রবণরসিক অন্যদিকে তার সংসারের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং বিষয় , সম্পত্তির প্রতি খেয়ালও বর্তমান । একদিকে যেমন কলকাতায় থেকে সে মুক্ত বিশ্বের অন্যদিকে সে গাওদিয়ার বা ,রস আস্বাদন করেছেসিন্দা । সর্বক্ষণ শশীর সাথে এই দ্বন্দ থেকেছে । যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তার দুটি সত্তা নিজেদের মত প্রকাশ করেছে অচিরেই । কিন্তু লেখক নিজের বর্ণনায় বলেছেন তাহার কল্পনাময় ' – অংশটুকু গোপন ও মূক । অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে তাহার সঙ্গে না মিশিলে একথা কেহ টের পাইবে না যে তার ভিতরেও জীবনের সৌন্দর্য ও শ্রীহীনতার একটি গভীর , সহানুভূতিমূলক বিচার পদ্ধতি আছে ।'

কলকাতায় ডাক্তারি পড়ার সময় তার জীবনে যে পরিবর্তন আসে বন্ধু কুমুদের সঙ্গে থেকে কলকাতায় থাকিবার সময় তাহার অনুভুতির ' – সেই প্রসঙ্গে লেখক বলছেন , মার্জনা আনিয়া দেয় বই এবং বন্ধু যে দুর্গের মধ্যে গোপাল তাকে পুরিয়া সিল ...

করিয়া দিয়াছিল । কুমুদ তাহা একেবারে ভাঙ্গিতে পারিল না বতে কিন্তু অনেকগুলি 'দরজা জানালা কাটিয়া বাহিরের আলো বাতাস আনিয়া দিল ।

শশীর দ্বৈত চরিত্র বোঝাতে গিয়ে লেখক এই উপন্যাসে শশীর জীবনের এমন একটি দিক বর্ণনা করেছেন যা আপাতভাবে প্রকট না হলেওপ্রচ্ছন্ন অবস্থাতেই তা শশীর , জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে । শশী ডাক্তারি পড়তে কলকাতা যায় এবং সেই শহরের তার সাথে সাথে ,আদব কায়দা সে শিখতে থাকে । তবে শুধুমাত্র আদব কায়দা নয় গ্রামের জীবনে অভ্যস্ত যুবক শশীর সামনে যেন এক নতুন জানালা খুলেযায় । সেই হাওয়া তার মননের গভীরে প্রবেশ করে এতই গভীরে যে সহজে তা দেখা যায়না , কিন্তু শশীর জীবনে তার ভীষণ প্রভাব পড়তে থাকে । এতদিন যে গ্রামে সে মানুষ হয়েছে সেই গ্রামে ফিরে যেতে তার দ্বিধা বোধ হয় । তার ছোটবেলার গ্রাম তার কাছে পরবাস মনে হতে শুরু করে । শহুরে সভ্যতার অভাবে তার গ্রামের কাদামাখা মেঠো পথ বেশিই অন্ধকার মনে হয় । উপন্যাসের বিভিন্ন অংশে শশী বলে যে যে এই গ্রামের থেকে চলে যেতে চায় । যে যেতে চায় বিলেতেসেখানে গিয়ে সে আরও বড় , প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে , ফিরে এসে শহরে পসার জমাতে চায় , ডাক্তার হতে চায় চায় । এই সকল অংশে শশীর চরিত্রের মধ্যে তার বাবা গোপালের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । সে স্বপ্ন থেকে তার ভালোবাসার মানুষের একদিন ' – লেখক লিখেছেন , কেয়ারী করা ফুলবাগানের মাঝখানে বসানো লাল টাইলের ছাওয়া বাংলোয় শশী খাঁচার দামী ব্লাইজে ঢাকা বুকখানা শশীর বুকের কাছে ,মধ্যে কোনারি পাখির নাচ দেখিবে ,স্পন্দিত হইবে-আলো হাসি গান আনন্দ আভিজাত্যকিসের অভাব তখন থাকিবে - ?শশীর'

এই দুয়ের দ্বন্দে ধীরে ধীরে শশী নাজেহাল হয়ে পড়ে বিভিন্ন সময়ে নিজের কথাকে , সে নিজে বিশ্বাস করতে পারে না। নিজের সিদ্ধান্তকে নিজেই সন্দেহ করে এবং তার চারপাশের মানুষজনকে একে একে হারাতে থাকে । সেন দিদিযাদব ,পাগলদিদি , যামিনী কবিরাজের মৃত্যু হয় তার চোখের সামনে । সেন ,পণ্ডিতদিদির সাথে তার সম্পর্কের গভীরতা লেখক নিপুনভাবে অঙ্কন করেছেন উপন্যাসে । এছাড়াও বাকি

সকলে তার খুব কাছের লোক ছিলেনসকলের সাথে মতের মিল না হলেও কাউকে , শশী অস্বীকার করতে পারেনা । এদের মৃত্যু যেমন শশীকে একা করে দেয় ঠিক গোপাল এবং পরানের গ্রাম ছেড়ে চল ,তেমনই কুসুমে যাওয়া শশীর জীবনকে এক বন্ধ গলির সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় । শশী কোথাও যেতে পারেনা এবং তাকে গ্রামেই থেকে যেতে হয় । সে এই গ্রামে থাকে এবং তার মনে হয় সে এখানে আটকে পরেছে। লেখক বর্ণনা করেন শশীর মনে হয় চিরকালের জন্য সে মার্কামারা ' – এই গ্রাম ছ – ডাক্তার হইয়া গিয়াছেোড়িয়া কোথাও যাইবার শক্তি নাই । '

আমাদের জীবনের এক একটি গ্রন্থিতে অবিশ্বাসী যন্ত্রণা মানুষকে আত্ম ক্ষয় প্ররোচিত করে কেমন ভাবে যামিনী কবিরাজের মৃত্যু তার প্রমান। সন্দেহপ্রবণ যামিনী কবিরাজ শশীর প্রতি ভয়ঙ্কর বিরূপ ছিলেন এবং বসন্ত রোগের চিকিৎসায় তার স্ত্রী ডাক্তারের উপরে আস্থা রেখে ছিল সেটাও তার কাছে আক্রোশের কারণ। সেন দিদির প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ এখানে কাজ করেছে। ফলে ক্ষয় রোগের আক্রমণ অনুভব করলেও যামিনী কবিরাজ মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ও শশীর কাছে কিছুতেই হার মানতে চাননি। সংস্কারে বা অহংকার জীবনের প্রতি চিরকালীন মমতাকেও যে অতিক্রম করে মৃত্যুকে বরণ করার ঘোর সম্মোহন সৃষ্টি করতে পারে যাদব পন্ডিত আর পাগলা দিদি আত্মহননে তার পরিচয় পেল শশী। সমস্ত গ্রামবাসীর কাছে নিজের সূর্য বিজ্ঞানের অভ্রান্ততা প্রমাণ করার জন্য এবং সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের কাছ থেকে ভক্তিশ্রদ্ধ-া আদায়ের জন্য অসম্ভব আফিম খেয়ে মৃত্যুবরণ করেছে যাদব পন্ডিত। তার অনুগত হয়েছে পাগলা দিদি। যাদব পণ্ডিতকে সাধারণ মানুষের কাছ থেকেই ভক্তিশ্রদ্ধা - লাভের লোভে ঊর্ধ্ব আকাঙ্ক্ষায় শশীকে বাধ্য করল তাদের এই ছলনা মেনে নিতে। পরোক্ষে শশী তাদের মৃত্যুর কারণ হয়েছে। নিজেরই তৈরি পরিস্থিতিতে শশীকে বুঝতে হলো তার অসহায়তা কতখানি। একেই বলা যেতে পারে অদৃশ্য নিয়তি শক্তির অধীনতা।

শশী চেয়েছিল জীবনটাকে নিজের ইচ্ছায় গড়ে নিতে। কিন্তু বাস্তবে সে দেখলো সে নিজে এবং তার পরিচিত যাদব পন্ডিত পাগল দিদি সেন দিদি যামিনী কবিরাজ

বিন্দুবাসিনী গোপাল কুসুম সকলেই জীবন সন্ধানী হয়েও ঠিকমতো বাঁচতে না জেনে অজানা পথে ভুল পথে জীবন থেকে হারিয়ে গেছে অথবা অন্যমনস্কতাঅপচয়িত জীবনের ক্লান্তি হতাশা রিক্ততার ক্রম ক্ষয়িত মৃত্যুতুল্য জীবন টেনে নিয়ে চলেছে শারীরিক মৃত্যুর দিকে।

চিকিৎসক বলে শশীর কাছে মৃত্যু স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ বাস্তব। শশী এও জানে ডাক্তার হিসেবে সে ক্ষণিকের জন্য মৃত্যু থেকে রাখতে পারে। কিন্তু মৃত্যুর অনিবার্য তাকে প্রতিহত করার ক্ষমতা তার নেই। সেই অর্থে যাদের সে চিকিৎসা করেছিল তাদের কাউকেই সে বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি। বাসুদেব বাড়ুজ্যের ছেলে ভুতোকে বাঁচাতে পারেনি সে। যামিনী কবিরাজের সুন্দরী স্ত্রী হিন্দি সুচিকিৎসায় বসন্ত রোগ থেকে মুক্ত হলেও তার সৌন্দর্য শশী রক্ষা করতে পারেনি। একটা চোখ নষ্ট হয়েছে সেন দিদির। শশীর সামনেই সেন দিদি প্রায় অর্ধ মৃত্যু ঘটে গেছে। মানসিক বিকারগ্রস্ত সেন দিদি শেষ পর্যন্ত গোপালের অবৈধ সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা গেছে। এক্ষেত্রে শশীর বাস্তবতাবোধ অলক্ষ্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার ডাক্তারি বিদ্যা প্রয়োগের পক্ষে। মন থেকে সায় মিলল না তার। যার প্রতি একটা সুন্দর পৃথিবী ভাবছিল সেবাটির অপমৃত্যু শেষপর্যন্ত সেন দিদির বাস্তব মৃত্যু ঘটলো।

পুতুল নাচের ইতিকথা উপন্যাসের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি যে এঁকেছেন তার দুটি সূত্র জীবনমৃত্যু। আর সুতোয় বাঁধা পুতুলগুলো সংসারে বাঁধা বিভিন্ন মানুষজন তাদের - অন্তর হিংসাভাব বৈচিত্র এবং অসংখ্য ক্রীড়া কর্মে বিভিন্ন স্তর।

শশীর মনে এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব নির্মাণ করেছেন লেখক । যা শশীকে গাওদিয়ার মানুষ থেকে ক্রমে আলাদা করে। যা শশীকে শেষমেশ করে দেয় একা । এই দ্বন্দে থেকেই শশী ডাক্তার পরাজিত এবং একাকী নিঃসঙ্গ এক মানুষে পরিবর্তিত হয় ।

১১.৩ গল্পের নায়ক শশী এবং নায়িকা কুসুম এই বক্তব্যের যথার্থতা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার পুতুল নাচের ইতিকথা উপন্যাসে কুসুম চরিত্রের অঙ্কন করেছেন এক জটিল এবং অতলান্তিক গভীরতার মধ্য দিয়ে । কুসুম এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র এবং শশী ডাক্তারের সাথে তার সম্পর্কের অদ্ভুত উত্থান এবং পতন এই গোটা উপন্যাস জুড়ে পাঠকের মনস্তত্বে এক গভীর প্রভাব রেখে যেতে সমর্থ হয় । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শশী । উপন্যাসের একদম গোড়ায় তার সাথে দেখা হয় হারু ঘোষের । কিন্তু হারু জীবিত নয়বজ্রাঘাতে তার মৃত্যু হয়েছে । এভাবে হারু ঘোষের প্রসঙ্গে প্রথম উন্মোচিত হয় , গল্পের নায়কের পর্দা ,শশীকে চিনতে শুরু করে পাঠক ।

এই উপন্যাসে কুসুমের আবির্ভাব ভীষণ অনাড়ম্বর ভাবে শশী ডাক্তার পরাণের , কুসুম গিয়াছিল ' – সেই সময়ে লেখক লিখছেন ,বাড়িতে যায় মতিকে পরীক্ষা করতে সেই প্রথম উপন্যাসে কুমুমের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের । 'ঘাটে লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এটি । কুসুম এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র হলেও তার পরে গোটা সময় জুড়ে কুসুমের যে গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ চলবে তার কোনো আভাস উনি দেননি শুরুতে । ভীষণ নিরলিপ্তভাবে কুসুমের উপস্থিতি বর্ণনা করেন লেখক ।শশী এবং কুসুমের এই সম্পর্ক নানা দ্বিধা এবং দ্বন্দ্বের জটিলতায় পরিপূর্ণ । কুসুম কখনও নিজ কামনায় আকুল হয়ে আছড়ে পড়ে আবার শশী কখনও সমাজ , এবং নিজ মনস্তাত্বিক দ্বিধার শঙ্কায় জীর্ণ ।

কুসুমের চরিত্রের অন্যতম প্রধান দিক হল তার স্পষ্ট ভাষা । সে শশীর বাড়ি যায় পেটে ব্যাথার মিথ্যে অজুহাতে এবং গিয়ে শশীর সাথে গোলাপ চারা মাড়িয়ে দিয়ে তার সহজাত নির্লিপ্ত বদনে বলে ইচ্ছে করেই দিয়েছি ছোটবাবু । চারার জন্য এত মায়া ' ?কেন' শশীর ভালোবাসার চারাগাছ মাড়িয়ে সে প্রমাণ করতে চায় যে ওই গোলাপচারার মধ্যে শশী কি এমন দেখতে পায় যা কুসুমের মধ্যে নেইযে ?

ভালোবাসা শশী ওই গোলাপচারাকেদেয় সেই ভালোবাসা আসলে তো কুসুমেরই প্রাপ্য । এই স্পষ্ট কথা কুসুম ব্যাক্ত করে তার এই ছোট কাজের মধ্য দিয়ে ।

কুসুম যেহেতু পরাণের সঙ্গে বিবাহ সুত্রে আবদ্ধ সেই কারনে পরাণের চরিত্রও সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে । পরাণের প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন -'পরাণ সব বিষয়ে উদাসীন । সন্ধার আবির্ভাবে তাহার বোন আর বৌ যত ব্যাস্ত হইয়া ওঠেসে যেন ততই , ঝিমাইয়া যায় । রান্নাঘরে বসিয়া কুসুমের সঙ্গে সে প্রথম একটু গল্প জমাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। গল্প করিবার সময় না থাকায় কুসুম তাহাকে আমল দেয় নাই ; মানুষের আঁচল ধর-মেয়ে ?দাওয়ায় বসে হুঁকা টানগে না বাপু া পুরুষকে আমি দুচোখে দেখতে পারি না ।কুসুমের ভর্ৎসনায় চিরকাল পরাণের খারাপ লাগে - । তবে স্পষ্ট খারাপ লাগার ভাবটা এত অল্প সময়ের মধ্যে মনের একটা উদাস বৈরাগ্য ও দেহের একটা ঝিমানো আলস্যে পরিণত হইয়া যায় যেরাগিবার অবসর প্রায়ই সে পায় না , পরাণের সাথে তার স্ত্রী ' ।কুসুমের মনের বিস্তর ফারাক । এই ফারাকের পরিখা পেরিয়ে কিছুতেই ঝাঁঝালো কুসুমের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না পরাণের উদাস এবং আলস্যে ভরা মন । তাই কুসুমের অন্তর রয়ে যায় অন্তর্নিহিত এবং সম্পর্ক থেকে যায় শুধুমাত্র সামাজিক পরিচয়ে ।

কুসুমের নির্লিপ্ত স্বভাব আমরা গোটা উপন্যাসেই দেখতে পাই । সে অনায়াসে শশী ডাক্তারের সখের গোলাপ চারা পায়ে মাড়িয়ে দিতে পারে বার বার । সে কোন অছিলায় কাছে আস্তে পারে শশীর । কুসুমের কোন ভান নেইকোন অবরন নেই । এহেন , আবরণহীনা কুসুম প্রথম থেকেই বিভিন্নভাবে শশীকে জানিয়েছে তার মনে কথা। কখনও মতির নামে মিথ্যে কথা বলে সে শশীর সাথে কথা বলতে চেয়েছে কিছু বেশী । কখনও সে কুমুদকে বলেছে ছোটবাবু আমাদের বলতে গেলে একরকম আপনার ' কখনও আবার কুসুম শশীকে চরম অপমান করে । 'দুবেলা আসেন । ,লোক

এই কোথায় যেমন বোঝা যায় শশী ডাক্তার কুসুমের প্রতি উদ্বিগ্ন ঠিক তেমনই আরেকটি ঘটনায় এই একই মানসিক প্রবৃত্তি ফুটে ওঠে কুসুমের থেকে । যাদব

পণ্ডিতকে নিয়ে শশী যখন খানিক বিব্রত তখন কুসুম এসে জানতে চায় তার এমন মুখের কারন কি । সে বলে তার মুখ কেন এত শুকনো লাগছেকথার উত্তরে বিরক্তি , প্রকাশ করে শশী জানায় তার মন ভালো নেই এবং এর থেকে বেশী কৈফিয়ত সে তাকে দিতে পারবেনা । এই কথায় রুষ্ট হয়ে কুসুম বলে কৈফিয়ত কেউ চায়নি ' বিসুখ - তাই জানতে এলাম অসুখ ,আপনার কাছে। মুখ শুকনো দেখে মায়া হল যেচে মায়া করতে গেলে পদে পদে ,হয়েছে নাকি । সংসারে জানেন ছোটোবাবু 'অপমান হতে হয় ।

এই কোথায় কুসুমের শশীর প্রতি অভিমান ফুটে ওঠে । এর থেকে আরেকটি বিষয়ও বোঝা যায় সে সে শশীর প্রতি যতটা যত্নশীলতা সে পরাণের প্রতি নয় । কারন , পরাণের সাথে তার এই ধরনের কোন কথোপকথন পাঠক দেখতে পাননা এই উপন্যাসে ।

শশী এবং কুসুমের ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই বয়ারতে থাকে এবং তা শশীর চিন্তার কারন হয়ে দাঁড়ায় । আগেই বোঝা গেছে কুসুম যেমন সহজ এবং সাবলীল এই প্রকাশের বিষয়ে শশী তা নয় । তাই শশী বলে ইচ্ছে হলেই একটা কাজ কি ,আমরা ছেলেমানুষ নই' বুঝেসুঝে কাজ করা দরকার । একে তো দ্যাখো পরান আমার ?আমরা করতে পারি এই কোথায় শশীর 'উপকার করতে গিয়ে চিরকাল ওর অপকারই করেছি । ,বন্ধু কুসুমের প্রতি এবং সর্বোপরি তার সংসারের প্রতি এক গভীর উদ্বেগ পরিলক্ষিত হয়।

যখন কুসুম বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার জন্য রওনা দিলে শশী বাজিতপুর যাবে বলে আসে এবং তার সাথে দেখা হয় । কুসুম ভীষণ সন্তর্পণে একবার তার বাপের দিকে তাকিয়ে নেয় এবং শশীকে জিজ্ঞাসা করে 'আমার জন্য এলেন আজ', শশী তার উত্তরে হ্যাঁ বলেন এবং এতে কুসুমের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । এই উজ্জলতাই হয়তো শশী এবং কুসুমের অন্তরের প্রেমের আখ্যান সঠিকভাবে বর্ণনা করতে পারে ।

এভাবেই শশী এবং কুসুম এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হিসেবে গড়ে ওঠে এবং তাদের জীবনের ছড়াই এবং উতরাই এই উপন্যাসের মূল চালিকা শক্তি হয়ে ওঠে ।

যদিও কখনও তাদের মিলন হয়না এই উপন্যাসে তবুও তাঁরা এই উপন্যাসের নায়ক এবং নায়িকা ।

১১.৪ ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব উপন্যাসের নায়িকা কুসুমের চালিকাশক্তি

বাংলা সাহিত্যে নারীচরিত্র সর্বদা গভীর এবং জটিল মনস্তাত্ত্বিক রুপে অঙ্কিত হয়েছে । শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং পরবর্তীকালে ,রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , অন্যান্য সাহিত্যিকদের লেখায় বিভিন্ন নারীচরিত্রদের উপস্থিতি আমরা দেখতে পাই যা গভীর এবং জটিল মনস্তত্তের পরিচায়ক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার পুতুল নাচের ইতিকথা উপন্যাসে কুসুম চরিত্রের অঙ্কন করেছেন এক জটিল এবং অতলান্তিক গভীরতার মধ্য দিয়ে । কুসুম এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র এবং শশী ডাক্তারের সাথে তার সম্পর্কের অদ্ভুত উত্থান এবং পতন এই গোটা উপন্যাস জুড়ে পাঠকের মনস্তত্তে এক গভীর প্রভাব রেখে যেতে সমর্থ হয় ।

পুতুল নাচের ইতিকথা এককথায় মানুষের জীবনের অদৃশ্য নিয়তিঅলক্ষ্য জীবনের , তারই কাহিনী।উপন্যাসের অনেক ---টানে নানা ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে যামিনী কবিরাজ ও ,চরিত্রই এদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ।যাদব পন্ডিত ও তার স্ত্রী পাগলদিদি শশীর পিতা,সেনদিদি,তার অসাধারণ সুন্দরী স্ত্রী শঙ্করীগোপাল কুসুম মতি শশী--- সবাই গাওদিয়ার গ্রামজীবনে বিশেষ তাৎপর্যময় জীবনযাপন করেছে।কিন্তু তবুও উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত শশী ও কুসুমের রহস্যময় প্রেম সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা ও সেই সম্পর্ক ভাঙার ব্যাথারই কাহিনী।

শশী উপন্যাসের নায়ক ও সেই মূলসূত্রে কুসুম উপন্যাসের নায়িকা।অবশ্য পরবর্তীকালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়তির অদৃশ্য সুতোর টানের কথা স্বীকার না করে বলেছেন উপন্যাসের চরিত্রগুলো যে পুতুল নাচের মতোই নেচে চলেছে তার প্রেক্ষাপটে আছে মানুষেরই বাস্তব সমাজেসমাজে নানা শক্তির সংঘাত ও চরিত্র গুলির পরস্পর বিরোধী আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব।অর্থাৎ এই উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের যে পরিণতি ঘটেছে তার দায়

সেই সব চরিত্রগুলির নিজেদেরইকোনো অলৌকিক নিয়তির শক্তি নয়।এই দৃষ্টিকোণ , থেকে বলা যায় লেখক শশী ও কুসুমের যে প্রেমকাহিনী রচনা করেছেন তার ভিত্তিতে আছে বাস্তব মনোস্তত্ত্ব ও তার রহস্যময় ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া।

আর সেই মনস্তাত্ত্বিক কাহিনীর কেন্দ্রে কুসুম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। যার মধ্য দিয়ে লেখক ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কে বিশ্লেষণ করেছেন। কুসুম একটু একটু করে ভেতরের দিকে নানা আবরণ ভেদ করে ফুটে উঠতে চেয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'ঝরে গেছে কুসুম'।এই উপন্যাসে কুসুমের আবির্ভাব ভীষণ অনাড়ম্বর ভাবে শশী , – সেই সময়ে লেখক লিখছেন ,ডাক্তার পরাণের বাড়িতে যায় মতিকে পরীক্ষা করতে 'কুসুম গিয়াছিল ঘাটে'। সেই প্রথম উপন্যাসে কুমুমের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এটি । কুসুম এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র হলেও তার পরে গোটা সময় জুড়ে কুসুমের যে গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ চলবে তার কোনো আভাস উনি দেননি শুরুতে । ভীষণ নিরলিপ্তভাবে কুসুমের উপস্থিতি বর্ণনা করেন লেখক । এই নিরলিপ্ততার মধ্য দিয়ে আসন্ন খেলার কোন আভাস তিনি দেন না ।

কুসুমের চরিত্রের দ্বন্দ্ব তখন থেকেই শুরু হয় যখন কুসুম মতির শরীর সম্বন্ধে মিথ্যে বলতে থাকে শশী ডাক্তারকে । সে মতিকে এক রকম কথা বলে আবার মতির বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্য কথা বলে শশী ডাক্তারকে । সে বলে -'রোজ একবার এলেই হয়জ্বরে ? দেখ ,ভুগছে মেয়েটাে তো যাওয়া উচিতকদিন আসেননি বলে বাড়ির সবাই কত ? কথা বললে ছতবাবু। বললে শশী আমাদের মস্ত ডাক্তার হয়েছে না ডাকলে আর , আসা হয়না। মতি কি বললে জানেন ?– ছোটবাবুর অহঙ্কার হয়েছে ।কুসুম ' কোথাও তার এতটুকুও দ্বিধা , এভাবেই অনায়াসে সাজিয়ে গুছিয়ে বানিয়ে কথা বলে কাজ করেনা । সে এমনই নির্লিপ্ত যে কামনা ,কিন্তু তার মধ্যে যে চাওয়া রয়েছে , তা পাঠক যেমন বুঝতে , রয়েছে তা সেই নির্লিপ্ত স্বভাবের মধ্য দ্যেও ফুটে ওঠে তেমন বুঝতে পারে শশী ডাক্তার ,পারেন।বলে আমার ,তাই শশী আগাইয়া যায়' কাজ আছে বৌ। কাল এসে তোমার মিথ্যে কথা শুনবো । '

লেখক শশীর পরিচয় দিয়েছেন এই ভাবে যে শশীর চরিত্রে দুটি ভাগ স্পষ্ট আছে। " অন্যদিকে ,একদিকে তাহার মধ্যে যেমন কল্পনা ভাবাবেগ ও রসবোধ এর অভাব নাই তেমনি সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধি ও সম্পত্তির প্রতি মমতাও তাহার যথেষ্ট। তাহার তাহার বুদ্ ...কল্পনাময় অংশটুকু গোপন ও মূকধি সংযম ও হিসেবে প্রকৃতির পরিচয়ই মানুষ সাধারণত পায়"। এমন সুশীল প্রতি অন্তরের অবদমিত প্রেম কামনা রহস্যময় টানাপোড়েনে কুসুমের চরিত্র অদ্ভুতভাবে আক্রান্ত। সংসারে কেউই এমনকি শশী ও আচরণের মধ্যে কোন অসঙ্গতি খুঁজে পায়না। স্বামী পরানের প্রতি তার ঠিক কী রকম মনোভাব তার কোনো স্পষ্ট পরিচয় লেখক আমাদের দেননি। কিন্তু পরানের সংসারে শাশুড়ি মোক্ষদা এবং ননদ মতি কে নিয়ে কুসুম যেভাবে দিন যাপন করে সাংসারিক কাজকর্ম যে রকম আচরণ করে অনেক সময় তার রহস্যের হদিস মেলে না। অনায়াসে সে মিথ্যা কথা বলে। সে বিষয়ে তার কোন সংকোচ নেই। মতিকে ওষুধ না দিয়ে দিয়েছি বলতে তার কোন অসুবিধা হয় না। সামান্য কারণে পরিজনদের সঙ্গে কলহ করতে তার বাধে না। কুসুমের বাবা এই বিষয় মনে করেন কুসুম ছোট মেয়ে বহু আদরে মানুষ হওয়ায় সে একটু খামখেয়ালি প্রকৃতির অকারনে দিও খামখেয়ালি বলে স্নেহ মিশ্রিত প্রশ্রয় দিয়েছেন "কত বছর আর কুসুমের পাগলামি দেখে গেছেন"। কিন্তু বেশ বোঝা যায় কুসুমের এই অসভ্য আচরণ ও পাগলামি লঘু স্বভাবের ফল নয়। এর সবকিছু পশ্চাতে কারণ আছে। তার পিতা সচ্ছল অর্থবান লোক তার কাছে বনানীর অনেক কিছুই বন্ধক কাছে সুতরাং স্বামীর গৃহে কুসুমের প্রতিপত্তি স্বাভাবিকভাবেই বেশি। সেই সঙ্গে আছে প্রবল আত্মমর্যাদাবোধ। সে জমিদার বাড়ির মেয়েদের অবজ্ঞা সহ্য করে পাশে বসে যাত্রা দেখতে রাজি হয়নি। কুমুদ তাকে ব্রাহ্মণ ভেবে তুচ্ছ করতে চেয়ে তুমি সম্বোধন করলে সঙ্গে সঙ্গে কুসুম জবাব দিয়েছে কথা বলতে শেখো নি দেখছি তুমি।ভদ্দর লোক তোগ্রাম সমাজের নানা সংস্কার সে অনায়াসে অমান্য ! করেছে নিজের বুদ্ধিতে যা ভেবেছে তা স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ বা কুণ্ঠাবোধ করেনি। তাই যাদব পণ্ডিতের স্বেচ্ছামৃত্যু নিয়ে গ্রামের মানুষজন যখন উচ্চকণ্ঠ কোলাহল মুখর হয়েছে তখন কুসুম সহজে বিদ্রুপ করেছেযা সব " ----

গাঁয়ে সত্তর বছরের একটা বুড়ো মড়বে তাই নিয়ে দশটা গাঁয়ের লোক হৈ !মজার কান্ড "হৈ করছে।বেঁচে থাকলে আর কত দেখব। এইরকম আত্মবোধ থেকে সে অনায়াসে উদ্ধত ভঙ্গিতে উনুন থেকে জ্বলন্ত কাঠ এনে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বেলেছে। সংসারের কোন ক্ষেত্রেই সে হার মানতে প্রস্তুত নয়।সে যত তুচ্ছ বিষয়ই হোক।অথচ মাঝে মাঝেই তারা আচরণে অদ্ভুত বালিকা সুলভ চাপল্য দেখা যায়। বয়সের ছাপ তখন তার অঙ্গ থেকে একেবারে ঝরে পড়ে। অথচ সাংসারিক বুদ্ধি যে ছিল তা নয়।বহু সময় ব্যক্তিগত জীবনে বিশেষ করে বিন্দু রানীর করুণাতুর ব্যাপার শশী আর কারোর কাছে না বলে কুসুমের কাছেই বলেছে। এমনই কুসুমের মেজাজ ও আচরণ যে সবাই তাকে অনেকটাই পাগলামি বলে মনে করে।

অথচ এই উপন্যাসের পাঠক হিসেবে আমাদের একটুও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কুসুম চরিত্র ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব এর এক নিখুঁত উদাহরণ। ফ্রয়েড মানুষের অবচেতনেই যে অবদমিত কামনার অদ্ভুত রহস্য আবিষ্কার করেছেন তারই সূত্র ধরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কুসুম চরিত্রটি কে সৃষ্টি করেছেন। কুসুমের সমস্ত আচরণে প্রেক্ষাপটেই আছে শশী। শশীর প্রতি তার অবদমিত প্রেম কামনার তারণা।নানাভাবে শশীর মনকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছে সে। কিন্তু শশীর মধ্যে যে কল্পনা কাজ করতো কুসুমের মধ্যে প্রেম বাসনা সেইরকমভাবে তেমন করে রূপ পায়নি। তার সমস্ত প্রেম আকর্ষণ এর মধ্যেই ছিল ফ্রয়েড কথিত দেহ বাসনার ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া। - এই ব্যাপারটি নানাভাবে কুসুম শশীর কাছে প্রকাশ করেছে। কিন্তু সুশীল মনে এর কোন অনুকূল প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। একেবারে শেষ সময় যখন কুসুম গাওদিয়া গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে মনঃস্থির করেছে তখন শশীর অবচেতনেই কুসুমের জন্য একটা ভীষণ কামনার আকর্ষণের সৃষ্টি হয়েছে তা সে টের পেয়েছে। কিন্তু ততদিনে কুসুমের মনের আগুন নিভে গেছে। কুসুম সম্পূর্ণ বুঝে গেছে শশীর প্রতি তার সেই কামনার কিছুই অবশিষ্ট নেই। তাই খুব স্পষ্ট করেই সে বলেছে---

লাল টকটকে তাতানো লোহা ফেলে রাখলে তাও আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে যায়। যায় " সে মরে ,?কুসুম কি বেঁচে আছে ?কে যাবে আপনার সঙ্গে?কাকে ডাকছেন ছোট বাবু?না "গেছে।

কুসুমের মনের এই আকস্মিক মৃত্যু ভিতরে ভিতরে একেবারে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল। কুসুম শিশির সম্পর্কের টানাপোড়েন শেষপর্যন্ত ব্যক্তির আর্থিক সংকটের আধুনিকতায় শশীকে গ্রামে থেকে যেতে বাধ্য করল। অন্যদিকে কুসুম চরিত্রের এই পরিণতি খুবই স্বাভাবিক। ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান তত্ত্ব অনুযায়ী অবচেতন মনে অবদমিত কামনা এমনি করেই বারবার আঘাত পেতে পেতে শেষ পর্যন্ত একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায়। কুসুম চরিত্রটি এদিক থেকে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে এক বিরল ব্যতিক্রমী চরিত্র।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১. পুতুল নাচের ইতিকথা উপন্যাসে ফ্রয়েডের মনোস্তত্ত্বের নিখুঁত উদাহরণ কোন চরিত্রটি ?

উত্তর- কুসুম চরিত্র ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব এর এক নিখুঁত উদাহরণ। ফ্রয়েড মানুষের অবচেতনেই যে অবদমিত কামনার অদ্ভুত রহস্য আবিষ্কার করেছেন তারই সূত্র ধরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কুসুম চরিত্রটি কে সৃষ্টি করেছেন। কুসুমের সমস্ত আচরণে প্রেক্ষাপটেই আছে শশী। শশীর প্রতি তার অবদমিত প্রেম কামনার তারণা।নানাভাবে শশীর মনকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছে সে। কিন্তু শশীর মধ্যে যে কল্পনা কাজ করতো কুসুমের মধ্যে প্রেম বাসনা সেই রকমভাবে তেমন করে রূপ পায়নি। তার সমস্ত প্রেম আকর্ষণ এর মধ্যেই ছিল ফ্রয়েড কথিত দেহ বাসনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া।

২. পুতুল নাচের ইতিকথা উপন্যাসে লেখক মতি চরিত্রের কী বর্ণনা দিয়েছেন লেখ।

উত্তর- ‘ রসালো ফলের মতো কোমল রং যে মতির, প্রতিমার মতো অমন নিখুঁত মুখ’ এই সব সত্তেও মতি অপরিচ্ছন্ন থাকে, শশী তার চিকিৎসা করতে এসে সাবান না মাখা নিয়ে তাকে বলে ।

১১.৫ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পুতুল নাচের ইতিকথা উপন্যাস কুমুদ মতি উপাখ্যান সম্পর্কে লেখ।

মন্তব্য

২. পুতুল নাচের ইতিকথা উপন্যাস শশীর নিঃসঙ্গ মনস্তত্ত্ব বিচার করো।

৩. এই উপন্যাসে নায়ক শশী নায়িকা কুসুম বক্তব্যের যথার্থতা বিচার করো।

১১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়- নিতাই বসু

২. বক্তব্য---ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

৩. নিয়তিবাদ উদ্ভব ও বিকাশ- সুকুমারী ভট্টাচার্য।

একক ১২ আরোগ্য নিকেতন- উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ও গঠন

বিন্যাসক্রম

১২.১ উৎস

১২.২ ঔপন্যাসিক বৃত্তান্ত

১২.৩ তারাশঙ্করের উপন্যাসিক বৈশিষ্ট্য

১২.৪ প্রতিবেশ ও প্রকৃতি উপন্যাসের প্রাণস্বরূপ

১২.৫ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১২.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১২.১ উৎস

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসটি ১৩৫৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।তার পূর্বে "সঞ্জীবন ফার্মাসী" নামে ১৩৫৯ এর শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

১২.২ ঔপন্যাসিক বৃত্তান্ত

বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে কুলীন ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন তারাশঙ্কর।পরবর্তীকালে উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি ভর্তি হন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ এবং চলে আসেন কলকাতায়।কিন্তু কলেজের পাঠ শেষ না করেই তিনি আবারও গ্রামে ফিরে আসেন। বিপ্লবী দলের সাথে সংস্পর্শ থাকায় পুলিশের দৃষ্টি ছিল তার ওপর। গ্রামে সমাজ সেবার কাজ শুরু করেন এবং তারপর ১৯৩২ সালে কলকাতায় আসেন তিনি।তারপর সাহিত্যকে জীবিকা করে লিখে চলেন একটার পর একটা লেখা।অজস্র উপন্যাস এবং গল্প গ্রন্থ লিখেছেন। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। জীবনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন ধরনের মানুষকে তিনি তার উপন্যাসে তুলে এনেছেন।তিনি একজন সফল শিল্পী এবং জীবনের পূর্ণতা সন্ধানের সন্ধানী।

১২.৩ তারাশঙ্করের উপন্যাসিক বৈশিষ্ট্য

তিরিশের যুগের আগে বিশুদ্ধ বাংলা উপন্যাস রচিত হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। তার কারণ আমাদের সমাজ বৈশিষ্ট্য। "বিশুদ্ধ উপন্যাসের পক্ষে প্রয়োজনীয় নিশ্চিন্ত নিরাসক্তি অবশ্যই বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে দুর্লভ। এই দুর্লভতার হেতু আমাদের স্বদেশীয় জীবন বিন্যাসের মধ্যে নিহিত। প্রথমত, আমাদের সমাজে জীবনে আমরা ইংল্যান্ডীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থানের ন্যায় ব্যাপক পরিবর্তন গর্ভ কোন সামাজিক আলোড়ন প্রত্যক্ষ করিনি। আমাদের যা কিছু চেতনাগত আলোড়ন তা প্রধানত চাকুরী মুখী ও কলকাতাকেন্দ্রিক। ফলে জীবনের সার্বিক প্রসারের কোন ভূমিকা এখানে প্রস্তুত হয়নি"।

বরং আমাদের জীবনে "এক দিকে যুদ্ধ দিগন্তকে বিস্তৃত করেছে,আর একদিকে যুদ্ধপরবর্তী অধ্যায়েই চাকরি প্রাণ মধ্যবিত্তিক সত্য যুগের অবসান ঘটলো। একদিকে বিপ্লব ও রূপান্তরের বিশ্ববোধ, অপরদিকে ঘনঘন জাতীয় আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গের নিষ্ফল আলোড়ন;একদিকে ফ্রয়েডের অবচেতনলোকের আবিষ্কার,অপরদিকে এঙ্গেলস্ মার্ক্সের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের নবীন জ্ঞান- তিরিশে উপান্তে এইসবের সাহায্যে জট পাকানো বাস্তব জীবনের গ্রন্থিমোচনের জন্য দুষ্পাঠ্য বাস্তবকে ব্যাখ্যা করার দায় ছিল ঔপন্যাসিকদের"।

কল্লোল যুগ থেকেই এই প্রয়াস শুরু হল ।একসঙ্গে দেখা দিলেন বুদ্ধিদীপ্ত তিন উপন্যাসিক-ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,অন্নদাশঙ্কর রায় ও গোপাল হালদার।আর এরই পাশাপাশি হৃদয়বান উপন্যাসিক হিসেবে উপস্থিত হলেন- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়,বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়- এই তিন বন্দ্যোপাধ্যায়।সমালোচকদের মতে ত্রিশের যুগের বাংলা উপন্যাস সাবালকের দ্বিধা মুক্তি অর্জন করেছে এই তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারণেই। "তিনজনের মধ্যে একই সঙ্গে কাজ করেছে একটা বোধ যার মূল কথা হল সংকট। তারাশংকর দেখিয়েছেন একটা শ্রেণি সংকট। বিভূতিভূষণ দেখিয়েছেন একটা অনুভুতির সংকট। মানিক দেখিয়েছেন ব্যক্তির সংকট অথবা জটিলতা। তারাশঙ্করের ইতিহাসবোধ,

বিভূতিভূষণের প্রকৃতি ও মানিকের সমাজবোধ এই জটিলতার ওপর আলো ফেলেছে।"

এদের মধ্যে তারাশঙ্কর জীবনের ব্যাপক অভিজ্ঞতায়,অজস্র বিচিত্র- সরল_জটিল-প্রতিষ্ঠিত- অবহেলিত মানুষের চরিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর উপন্যাসে। তার প্রায় সব উপন্যাসের পটভূমি তাঁর নিজের অঞ্চল রাঢ়। এখানকার মানুষদের তিনি খুব কাছ থেকে চিনতেন এবং জানতেন।সেইসব মানুষগুলোর দিনযাপন, জীবন চারণ,তাদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য,তাদের সংকট,তাদের শ্রেণী-সংগ্রাম সমস্তকিছুই তারাশঙ্করের নখদর্পণে ছিল। আর তাঁর রচনার ক্ষেত্রে তিনি সেগুলোকেই সাহিত্যের মোড়কে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো যুব পরিবর্তনের একটি সময়ের সন্ধিক্ষণে।

পুরাতন এবং নবীনের দ্বন্দ্ব বারবার তার লেখায় দেখা যায়। যা সেইভাবে আর অন্য কোন উপন্যাসিকদের রচনার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় না। একদিকে অস্তগামী জমিদার বংশ জমিদারি সম্প্রদায় আবার অন্যদিকে রয়েছে কাহার থেকে ডোম,বৈষ্ণব থেকে শাক্ত, কৃষক থেকে বেদে, সাঁওতাল থেকে ঝুমুর গানেরদল- বিচিত্র মানুষ বিচিত্র তাদের পেশা। তৎকালীন সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসোন্মুখ ও নবীন বুর্জোয়া সভ্যতার উত্থান এই দুইয়ের সন্ধিক্ষণকে এবং সেই দ্বন্দ্বকে তারাশঙ্কর নিজস্ব ইতিহাস চেতনার দ্বারা অত্যন্ত দক্ষতায় উপন্যাসে দেখিয়েছেন।সমগ্র রাঢ় জনজাতি একটা সম্পূর্ণ সামগ্রিক চিত্র তিনি তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। আসলে তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতা ছিল ব্যাপক মানব সমাজ। যা তাঁর লেখায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে ধরা দিয়েছে।সমাজের বিভিন্ন দিক, বিভিন্ন মানুষ এবং বিভিন্ন পেশার মানুষ সব সময় তার গল্পে অগ্রাধিকার পেয়েছে। তবে শুধু যে অঞ্চল, অঞ্চল ভিত্তিক মানুষ অর্থাৎ আঞ্চলিক পটের সীমাবদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন তিনি, তা নয়। আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করে তিনি পৌঁছে গেছেন জীবনের চরম সত্যে। দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধের চরম আঘাত সমস্ত পৃথিবী কে সংবেদনশীল সাহিত্য জগতকে ব্যাকুল করেছে। তারাশঙ্করও তার ব্যতিক্রম নন। কিন্তু এই সংকটে তিনি অস্থির হননি। তাঁর জীবন দর্শনে মানুষের জীবনের প্রতি মমতা অবিশ্বাস অবিচল থেকেছে। বিদ্রোহের মুখরতা যেমন তার সাহিত্যে নেই তেমনি কোনো মতবাদের আতিশয্যও নেই। আছে কেবল সমাজের পরিবর্তনের জটিল-কুটিল পথপরিক্রমা। তিনি কংগ্রেস রাজনীতির সমর্থক ছিলেন ব্যক্তিজীবনে। পাশাপাশি স্বদেশ চিন্তা ও স্বদেশ প্রেম ও তার মধ্যে গভীরভাবে আচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু স্বদেশ প্রেম জাতীয়তাবাদ বা কংগ্রেস তার ব্যক্তিগত জীবনে থাকলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্কর ফ্যাসিবাদের উত্থান তাকে চিহ্নিত করেছে। ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক গোষ্ঠীর প্রতিবাদ কিংবা প্রগতিশীল লেখক-শিল্পীদের সংগঠনের সভায় তিনি ক্রমশ জড়িয়ে পড়েছেন-

"তিরিশের দশকের অস্থির জীবনতরঙ্গে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর গ্লানি ও হতাশায় মানব মন যখন ক্লিন্ন, পথের অভ্রান্ত নিশানা যখন সংশয়াপন্ন, কোন দল বা মতের কাছে

আত্মসমর্পণ না করে যে লেখক নিজের বিশ্বাসে একনিষ্ঠ থাকতে পারেন তাঁর সম্পর্কে আমাদের ঔৎসুক্যের অভাব হয়না"।

তবুও শেষ পর্যন্ত শিল্পীদের ফিরে আসতে হয় নিজের শিল্পের কাছে। তারাশঙ্করও তাই রাজনীতির কর্মকাণ্ডে কখনো গা ভাসাননি, অভ্রান্ত বলে মনে করেননি কোন রাজনীতি বা আদর্শকে।কিন্তু অবহেলিত মানুষের জীবন কথা রচনা মানুষের প্রতি তার ভালোবাসার অভাব কখনও হয়নি।

তারাশঙ্করের সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মন্তব্য করেছেন-

"'জীবদেহে'র আকুতির সঙ্গে 'জীবনে'র চাহিদার জোড় মেলাতে তারাশঙ্করও

প্রথমাবধি সমস্যাবিদ্ধ হয়েছিলেন।অবশ্য জীবন ও জীবদেহাকৃতির সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা স্বতন্ত্র্য;- রাঢ় প্রত্যন্তবর্তী আপন জন্ম মাটি- বীরভূম-লাভপুরের গ্রাম জীবন নির্ভর। অশিক্ষা, সামাজিক উপেক্ষা,আর্থিক রিক্ততা এবং অন্ধ সংস্কারে জড়ানো সে জীবনে উদাত্ত যে আদিমতা ওতপ্রোত হয়েছিল, শহুরে ব্যবচ্ছিন্নতা লাঞ্চিত জীবনভূমিতে তার অভিজ্ঞতা দূরে থাক,স্বপ্নও ছিল অকল্পনীয়।ভঙ্গুর জমিদারিতন্ত্রের প্রতি অন্তরে শ্রদ্ধানত অন্তিম প্রতিভূ ছিলেন তিনি।সে যেমনই হোক,আসলে নূতন কালের চেতনা তাঁর সত্তায় স্বতন্ত্র মাত্রায় প্রকাশিত।'কল্লোল'-এর সঙ্গে অন্তরের মেলবন্ধন তাঁর ঘটেনি।"

'আমার কালের কথা','আমার সাহিত্য জীবন' প্রভৃতি গ্রন্থে তারাশঙ্করের মানবপ্রীতি,কাল চেতনা ইতিহাসের সন্ধিক্ষণের দ্বন্দ্ব চোখে পড়ে।তাঁর উপন্যাসে একদিকে যেমন বীরভূমের কাঁকুরে মাটি ও তার রুক্ষ মানুষ উঠে এসেছে, তেমনই দুর্গাপুর,আসানসোল চিত্তরঞ্জন,কুলটিও স্থান করে নিয়েছে তাঁর লেখায়।এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর আধ্যাত্ম বোধ।বৈষ্ণব,বাউল,আদিম যৌন বাসনা,শাশ্বত হিন্দুধর্মকে আত্তীকরণ করে তিনি তাঁর রচনা চালিয়ে গেছেন। চরিত্রগুলোকে নিয়ে গেছেন বিশ্বাসের ধ্রুবলোকে। অন্তর দিয়ে তিনি তাঁর মাটি ও মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন বলেই রাঢ়ের মানুষের সমগ্র বিষয় তার উপন্যাসে এত গভীরভাবে ধরা পড়েছে।

পাশাপাশি আত্মচেতনাকেও তিনি এড়িয়ে যাননি। বস্তুজগতের অতিরিক্ত কিছু আস্তিক্য অজ্ঞাত জগৎ।যাকে তিনি অস্বীকার করেননি কখনও।

১২.৪ উপন্যাসের গঠন শৈলী

তারাশঙ্করের উপন্যাস সম্পর্কে একটি অভিযোগ মাঝে মাঝেই শোনা যায়। তারাশঙ্করের উপন্যাস এর ক্যানভাস অনেক বড়। সেখানে অজস্র ঘটনা এবং অজস্র চরিত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। তারা এক সূত্রে অনেক সময় বাঁধা পড়ে না।ফলে গ্রন্থ ঐক্য নষ্ট হয় এবং সংহতি শিথিল হয়ে পড়ে। কাহিনীও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। কখনো ছোট-বড় অনেক কাহিনীকে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।যার ফলে পাঠক অমনোযোগী হয়ে পড়ে। বাইরের ঘটনা ও লোকজনের ভিড় অনেক বেশি থাকে গভীরতার চেয়ে।কিছু টুকরো ঘটনা ভিড় করে মূল কাহিনীকে অযথা জটিল করে দেয় বা মূল কাহিনীর যথার্থ বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাড়ায়। জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা ঘটনা চরিত্র উপন্যাসে উপস্থিত হয়ে কাহিনীকে দীর্ঘ করে দেয়। পাঠকের মস্তিষ্ক অকারণে ভারাক্রান্ত হয়।কিন্তু আদতে পাঠকের আকর্ষণ হারায় এ কথা সর্বদা সত্য নয়। কারণ বহু পাঠক বহুবিচিত্র জীবনকে উপন্যাসের পাতায় দেখতে চান,জটিল গভীর মনস্তত্ত্ব নানা দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের পরিবর্তে সহজ-সরল ভাবে বয়ে যাওয়া জীবনকে জানতে চান। তাদের কাছে তারাশঙ্করের উপন্যাস সর্বদাই আকর্ষণীয়।এত ঘটনা এত বিচিত্র বর্ণের মানুষ একমাত্র তারাশঙ্করের উপন্যাসেই দেখা যায়।

আরোগ্য নিকেতন উপন্যাস মূলত চিকিৎসক জীবন মশাই এর জীবন কাহিনী। এই কাহিনী বিবৃত হয়েছে বর্তমান ও অতীতের সমান্তরাল রেখায়। জীবন মশাই তার চিকিৎসা বৃত্তি পারিবারিক কর্তব্য করে গেছেন সম্পূর্ণ উপন্যাস জুড়ে। আর তার মাঝখানে স্মৃতিচারণ করেছেন,স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে এসেছে তার অতীতের ঘটনা। যা তার জীবনের শূন্যতা গুলিকে পূর্ণ করেছে। এখানে মূলত জীবনের সামগ্রিক একটা পরিচয় পাওয়া যায়।'সূচনা' ও 'শেষ' অধ্যায় দুটি বাদে সাঁইত্রিশটি অধ্যায় বিবৃত হয়েছে জীবনের মশাইয়ের এই পরিপূর্ণ কাহিনী। তার জীবন যেমন কোলাহল মুখর

তেমনি তিনি অবকাশে স্মৃতিচারণ করেছেন।দাম্পত্য নিয়ে আক্ষেপ করেছেন প্রেমকে স্মরণ করেছেন এবং মৃত্যুকে উপলব্ধিও করেছেন।

জীবন মশাইয়ের জীবনবৃত্ত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আকর্ষণীয়তায় পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছেন লেখক। একদিকে তার চিকিৎসক জীবন অন্যদিকে তার ব্যক্তিগত জীবন পরিপূর্ণভাবে সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন বেদনা সহ আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমকালীন সমাজ পটভূমি।একটি গোটা সমাজকে একটি দেশ ও কালকে লেখক তাঁর উপন্যাসে ধরার চেষ্টা করেছেন।কিন্তু একটি মানুষের কাহিনী বড় শিল্পের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। শিল্পের অন্যতম শর্ত হল ইতিহাস চেতনা। আর তারাশঙ্কর ইতিহাসের একটি বিশেষ দিকে প্রতি পক্ষপাত সত্বেও শিল্পীসুলভ নিরাসক্তি ও নিরপেক্ষতায় ইতিহাসের অনিবার্যকতাকে কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করেছেন। তার জন্য ইতিহাসের সন্ধিক্ষণের দ্বন্দ্বকে তিনি তাঁর উপন্যাসে তুলে এনেছেন। জীবন মশাই এর পাশাপাশি এসেছে প্রদ্যোত ডাক্তার ও নবগঠিত হাসপাতালের উল্লেখ। প্রাচীনকাল লোপ পাচ্ছে নতুন কাল অনেক সমৃদ্ধি ও সম্ভাবনা নিয়ে এগিয়ে আসছে। সত্য প্রকাশের জন্য যে ধরনের কাহিনী ও চরিত্র প্রয়োজন ছিল তাই-ই লেখকের উপন্যাস নিয়ে এসেছেন। সেইসঙ্গে এই দুইয়ের সংঘাতের অনিবার্য তা কাহিনী বিন্যাসে যথাযথভাবে ধরা পড়েছে। প্রদ্যোতের কাহিনি,নতুন হাসপাতাল গড়ে ওঠার কাহিনী,জীবন মশাই কে এবং তার আরোগ্য নিকেতনকে যে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে তা গল্প ধারায় স্বাভাবিকভাবেই এসেছে।

এই উপন্যাসের কাহিনীর বিকাশ বা গঠন কাঠামোর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মৃত্যুচেতনা। যে কোন শিল্পীরই তাঁর শিল্প রচনা একটা উদ্দেশ্য থাকে। জগৎ ও জীবন কে তিনি যেভাবে দেখেন পাঠকের কাছে তিনি সেই রহস্য কেই উন্মোচিত করতে চান। এই উপন্যাসের সৃষ্টিই হয়েছে মৃত্যু জিজ্ঞাসায়। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাই বারবার মৃত্যু জিজ্ঞাসা মুখোমুখি হতে হয়েছে চরিত্রগুলোকে। মানুষ আগাগোড়া মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করেছে। সমগ্র উপন্যাস এই বিষয়টি বারবার চোখে পড়েছে। উপন্যাসের নামের ব্যঞ্জনায় যা আসে বিষয়ের গভীরে ও তাই আলোচিত হয়।

উপন্যাস গঠনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পরিণতি। উপন্যাসের। হঠাৎ মঞ্জুরী কে এমন একটি জটিল সম্পর্কের ভিত্তিতে ফিরিয়ে আনলেন কেন লেখক! জীবন মশাই বারবার ভেবেছেন আতর বউ তার জীবনে ব্যাধি আর মঞ্জরী মৃত্যু। তার মনে হয়েছে ভূপী বোসের ব্যাধি ও মৃত্যুতে তিনি তৃপ্তি পেয়েছিলেন বলেই সেই ব্যাধি আর অকালমৃত্যু তার পুত্রের মধ্যে ফিরে এসে তাকে শাস্তি দিয়ে গেছে। আবার কখনও তিনি ভেবেছেন জ্যোৎস্না রাতের ছায়ায় মঞ্জুরি মৃত্যুকে সাক্ষাৎ করেছেন তিনি। সেই মঞ্জরী যখন ফিরে এলো এবং তার মৃত্যু হল তারপর জীবন মশায়ের জীবন বাসনাও শেষ হলো। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মৃত্যু হল। ডাক্তার হওয়ার যে বাসনা মঞ্জরীর কারণে শেষ হয়েছিল তার শেষ নিদান দিলেন তিনি এবং তার পর নিজের মৃত্যুকে রূপে বর্ণে গন্ধে স্পর্শে জানতে চেয়েছিলেন তিনি। এ ছিল তার চিরকালের আকাঙ্ক্ষা। কত রোগীর মধ্যে দিয়ে মৃত্যুকে দেখেছেন,তার স্পষ্ট লক্ষ্য অনুভব করেছেন। তার নিজের সময় কে আসবে তার মৃত্যুদূত হয়ে! আতর বউ নাকি মঞ্জরী নাকি বনু!এ সত্য তার জানা হয়নি।তার বাসনা অধরাই থেকে গেছে।

সমগ্র উপন্যাসটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় বিস্তৃত ক্যানভাস, অনেক ঘটনা, অনেক চরিত্র,তত্ত্বকথা আধ্যাত্মকিতা, মৃত্যুচেতনা- একের মধ্যে অনেক অথবা অনেকের মধ্যে এক,এই উপন্যাসের উপজীব্য। জীবন বাসনা,মৃত্যু অনিবার্যতা একটা গোটা উপন্যাসের বিষয় হয়েছে এবং তাকে ছোট-বড় নানা কাহিনী এবং নানা চরিত্রের মধ্য দিয়ে ক্লান্তিহীনভাবে পরিবেশন করে গেছেন লেখক। বিষয় বৈচিত্র্যের সঙ্গে গঠন বিন্যাসও তাকে সমান ভাবে সাহায্য করে গেছে উপন্যাস কে আকর্ষণীয় ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

১২.৫ প্রকৃতি – প্রতিবেশ উপন্যাসের প্রাণ স্বরূপ

"জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে দেখলাম---কামিনী গাছের গুঁড়িটির যেখান থেকে দুটি ডাল বেরিয়ে পৃথক হয়েছে, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি শুভ্রবস্ত্রাবৃত মূর্তি। মধ্যে মধ্যে

গাছের ডাল দুটিকে নাড়া দিয়ে দোলাচ্ছে। শিউরে উঠলাম।...খানিকটা গিয়ে তিনি হেসে উঠলেন।বললেন- জোৎস্না।কাল গাছের ফাঁকটায় জোৎস্না পড়েছে।"

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক চিরন্তন।সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষ প্রকৃতিকে বন্ধুর মতো আঁকড়ে ধরেছে,প্রকৃতিও তাকে আশ্রয় দিয়েছে।বিচিত্র, পরিবর্তিত প্রকৃতি মানুষের মধ্যে একদিকে যেমন সুখানুভুতি জাগিয়ে তুলেছে তেমনি আরেক দিকে ভয়ঙ্কর ও সর্বনাশী ভুমিকায় উপস্থিত হয়েছে।বেদ,রামায়ণ, উপনিষদ থেকে জীবনানন্দ পর্যন্ত প্রকৃতি হয়ে উঠেছে মানব জীবনের এক অনিবার্য উপাদান। কখনো পটভূমি, কখনো প্রতিবেশ,পরিবেশ কখনো মানব মন ব্যাখ্যায় সবচেয়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছে প্রকৃতি। কালিদাসের কাব্যের সময় থেকে বাংলা আধুনিক উপন্যাসে প্রকৃতি বারবার নানাভাবে উপস্থিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সার্থক ও যথাযথ ব্যবহার পাঠক কে অভিভূত করেছে। যে পটভূমিতে "কপালকুণ্ডলা"-র আবির্ভাব হয় এবং তার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়---"পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ?" তা কখনো ভোলবার নয়। কুন্দের যেদিন মরা হয়না,"বিষবৃক্ষ" উপন্যাসে তার উপযুক্ত পরিবেশ রচিত হয়েছে।"গোরা" উপন্যাসের পটভূমিতে বিনয় ললিতার নদীপথের হৃদয় উন্মোচন প্রকৃতির অনন্য রূপকেই ধরা দিয়েছে। মূল কথা কখনো প্রকৃতি উপন্যাসে কাহিনীকে তরান্বিত করেছে,কখনো কাহিনীর পরিপূরক হয়েছে, কখনো চরিত্র বা বক্তব্য প্রকাশের সহায়ক হয়ে উঠেছে, কখনো আবার শুধুমাত্র বহিরঙ্গের উপাদান হিসেবেই সীমাবদ্ধ থেকেছে।

রাঢ় অঞ্চল কে উপন্যাসে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের ভূমিকা সর্বাধিক।রাঢ়ের মানুষের কথা যেমন তিনি বলেছেন,তেমনি বলেছেন রাঢ়ের লাল রুক্ষ কাঁকুড়ে মাটি, তার আঁকাবাঁকা নদনদী, গাছপালা,কৃষি বাণিজ্যের কথা। সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃতি প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।

আরোগ্য নিকেতন এর ক্ষেত্রেও এরূপ দেখা যায়। এই উপন্যাসের মূল বক্তব্য হলো মৃত্যুচেতনা। মৃত্যুর অনিবার্যতা বা বৈচিত্র এবং তার সঙ্গে ব্যাধি রোগ এবং আরোগ্য প্রয়াস এরই কাহিনী। একই সঙ্গে জুড়ে গেছে কাল চেতনা। চিকিৎসা পদ্ধতিকে কেন্দ্র

করে এসেছে নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্ব। যেখানে কবিরাজি এবং অ্যালোপ্যাথি দ্বন্দ্ব দেখা গেছে। উপন্যাসে দেখা যায় কবিরাজি কেবল গাছপালা জরিবুটি উপর নির্ভরশীল নয় একটি বস্তু অতিরিক্ত আধ্যাত্মিক চেতনার উপর নির্ভরশীল। জীবন-মৃত্যুর অনিবার্য সংঘাত জয় পরাজয়। নাড়ির স্পন্দনে ধ্বনিত হয় মৃত্যুর সংকেত। আর অ্যালোপ্যাথি জানে বস্তুকে জীবাণুকে ধ্বংস করার অতি আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক কৌশল। এখানে তারাশঙ্কর যেমন জীবন মশাইয়ের গল্প বলতে চেয়েছেন। তেমনি প্রদ্যোত ও তার কালকেও অস্বীকার করেননি তিনি। বিজ্ঞানের আবিষ্কার এর কাছে মাথা নত করেছে তাঁর কবিরাজ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই উপন্যাসে প্রকৃতি ভূমিকা খুব বিশেষ রুপে নয় তার উল্লেখও ব্যবহার সীমিত তবে উপন্যাসে প্রতিবেশ রচনায় তারাশঙ্কর অনেক বেশি সার্থক। এখানে প্রতিবেশের ক্ষেত্রেও ব্যাধি ব্যাধি কে কেন্দ্র করে মৃত্যু তথা মৃত্যুর আগমনের সংকেত। রোগাক্রান্ত রোগী চারপাশের বিষণ্নতাকে লেখকের অতি সূক্ষ্মতায় বর্ণনা করেছেন।

আয়ুর্বেদিক যুগ অস্তমিত অ্যালোপ্যাথি বিজ্ঞানের নতুন যুগের উদয় এই হল গল্পের প্রেক্ষাপট।এই সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয় এর বর্ণনায় প্রকৃতি অনেকটা যুক্ত হয়েছে। পুরনোর অবক্ষয় ও নতুনের উদ্ভাস সম্পর্কে লেখক বলেছেন-এই আরোগ্য নিকেতন "স্থাপিত হয়েছিল প্রায় আশি বৎসর পূর্বে। এখন ভাঙ্গা ভগ্ন অবস্থা,মাটির দেওয়াল ফেটেছে, চালার কাঠামোটার কয়েকটা জায়গাতেই জোড় ছেড়েছে- মাঝখানটা খাঁজ কেটে বসে গেছে কুঁজো মানুষের পিঠের খাঁজের মতো"।

আবার কালান্তরের বর্ণনায় লেখক লিখছেন-

"যাবেন মহানগরী থেকে শতাধিক মাইল। চলে যাবেন বড় লাইনের ট্রেনে।...জংশনে নেমে পাবেন একটি অপরিসর শাখা-রেলপথ।মাইল দশেক গিয়ে পাবেন একটি সমৃদ্ধ গ্রামের স্টেশন।চারিদিকে দেখতে পাবেন কালান্তরের সুস্পষ্ট পরিচয়।দেখতে পাবেন,

একখানা ট্যাক্সি, একখানা মোটর বাস, সাইকেল রিকশা,গোরুর গাড়ি।...দেখতে পাবেন ভাঙ্গা-গড়ায় বিচিত্র গ্রামখানিতে পুরাতন-নূতনের সমাবেশ"।

এর পাশাপাশি সামন্ততন্ত্র ও বুর্জোয়া অর্থাৎ পুরাতন ও নতুন এর চমকপ্রদ বিবরণ প্রকৃতি প্রতিবেশের বর্ণনায় ফুটে উঠেছে-

"পাকা লাল কাঁকুরে তৈরি সড়ক ধরে যাবেন।দেখবেন প্রাচীনকালের জমিদারদের বড়ো বড়ো নোনা ধারা পাকা বাড়ি।ভাঙ্গা বাগান।ধসে পড়া পাঁচিল।শ্যাওলা পড়া মন্দির।পুকুরের ভাঙা ঘাট।পুরনো মন্দির। চারিদিকেই দেখবেন ধূলি-ধূসরতা; আবর্জনার স্তুপ! পতিত জায়গায় আগাছার জঙ্গল।এরই মধ্যে এক জায়গায় পাবেন এক পুরনো বৃদ্ধ বট,শাখা-প্রশাখা জীর্ণ, গোড়াটা বাঁধানো, তাতেও দেখবেন অনেক ফাটল।এইটি গ্রামের ষষ্ঠীতলা।"

এই বর্ণনা সামন্ততন্ত্রের জমিদারির কবিরাজির অস্ত যাওয়ার বার্তা বয়ে এনেছে। সেইসঙ্গে ঘোষিত হয়েছে নতুনের বার্তা-

"এইটিই হল বাজারপাড়া। প্রাণস্পন্দনে মুখরিত। মাল বোঝাই গোরুর গাড়ির সারি চলেছে,মানুষ চলেছে, কোলাহল উঠেছে,গন্ধও এখানকার বিচিত্র। বাজারটা দিন দিন বেড়ে চলেছে।...নবগ্রাম মেডিকেল স্টোর্সের ঝকঝকে বাড়ি, আসবাব, বহু বর্ণে বিভিন্ন বিচিত্র ওষুধের বিজ্ঞাপন আপনার দৃষ্টি অবশ্যই আকর্ষণ করবে। বুশশার্ট প্যান্ট পরা হরেন ডাক্তারকে গলায় স্টেথোসকাপ ঝুলিয়ে বসে থাকতেও দেখতে পাবেন। “পুরাতন দিনের সমৃদ্ধি আজ আর নেই। এমনকি বৃদ্ধ জীবন মশায় যখন পাঠকের সামনে উপস্থিত হন তখনো পটভূমিতে ফুটিফাটা বারান্দা,খোয়া ওঠা চারিদিকে জমে থাকা ধুলো দেখা যায়-" শুধু বারান্দার দুই কোণে দুটি রক্ত করবী গাছ সতেজ সমারোহে অজস্র লাল ফুলের সমৃদ্ধ হয়ে বাতাসে দুলছে ওই গাছটির দিকে চেয়ে আছেন বৃদ্ধ মশায়"। এ যেন নিভে যাওয়ার আগেই প্রদীপের শেষবার জ্বলে ওঠা। তারই অপরূপ দ্যোতনা এই প্রাকৃতিক প্রতীক।

প্রকৃতিকে এমনি করেই জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জুড়ে দিয়েছেন লেখক। মিশিয়ে দিয়েছেন জীবন কবিরাজের সঙ্গেও। যে গঠনকৌশল এ উপন্যাসটি রচিত সেই স্মৃতিচারণার প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির নিবিড় ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের সংযোগ স্থাপিত হয়েছে-

" সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ে ছিল। তৃতীয় প্রহরে শেষ পাদ। পূর্ব দুয়ারী ঘরের বারান্দায় বসেছিলেন। সামনে পশ্চিম দুয়ারী একতলা রান্না ঘরের চালের উপর দিয়ে আচার্য ব্রাহ্মণ দেয় বাড়ির উঠোনের বকুল গাছের মাথার উপর দিয়ে রৌদ্রদগ্ধ বৈশাখী আকাশ যেন তপোমগ্ন রুদ্রের অর্ধনিমিলিত তৃতীয় নেত্রের বহ্নি ছটায় ক্লিষ্ট নিথর। দিকে দিগন্তরে কোথাও ধ্বনি শোনা যায় না। বাতাসে ছিল না সেদিন। মনে হয়েছিল, বোধহয় সন্ধ্যার দিকে কালবৈশাখী ঝড় উঠবে। পশ্চিম দিগন্তে আয়োজন হতে আরম্ভ হয়েছে। জীবন ওই আকাশের দিকেই তাকিয়ে ছিল। তারও বুকে বোধহয় ঝড় উঠবে মনে হয়েছিল"।

ঝড় তো উঠেইছিল নব কৃষ্ণের দুই চিঠির তান্ডব ঝড় জীবন মশায়ের জীবনকে এলোমেলো করে দিয়েছিল।

মৃত্যু, রোগ এবং আরোগ্য এই উপন্যাসের আলোচ্য বিষয়। আলোচ্য কবিরাজি আর কবিরাজের অন্যতম অস্ত্র নাড়ী।যা বুঝতে,উপলব্ধি করতে প্রয়োজন ধ্যানের। প্রকৃতির সঙ্গে,পরমের সঙ্গে তার একান্ত নিবিড় সংযোগ, একাত্মতা-এই-ই কবিরাজি চিকিৎসা শাস্ত্র।এরও অসাধারণ বর্ণনা উপন্যাসে ধরা পড়েছে-

"রোগিনীর হাতছানি বিছানার উপরে যেমনভাবে ছিল- তেমনি ভাবেই রইল; জীবন দত্ত মণি-উপর আঙুলের স্পর্শ স্থাপন করলেন।চোখ বন্ধ করে পারিপার্শ্বিকের উপর যবনিকা টেনে দিলেন। প্রায় রিক্তপত্র অশ্বত্থগাছের একটি সরু ডালে একটি মাত্র পাতা, অতি ক্ষীণ বাতাসের প্রবাহে দৃষ্টির অগোচর কম্পনে কাঁপছে; সেই কম্পন অনুভব করতে হবে; অথচ অসতর্ক রূঢ় স্পর্শেই পাতাটি ভেঙে ঝরে যাবে। অতি সূক্ষ্ম স্পর্শানুভূতিকে প্রবুদ্ধ করে তিনি বসলেন।ধ্যানস্থ তো হওয়ার মতো"।

একটি শিশুর মৃত্যুতে চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছিলেন প্রদ্যোত ডাক্তার ।রোগ নির্ণয়ে, চিকিৎসায় ভুল হয়েছিল হয়তো।ওষুধ ঠিক ছিল না হয়তো বা ভেজাল ছিল।এক গাঢ় বিষাদ তাকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল। কিন্তু চিকিৎসকদের তো সেই জালে বাঁধা পড়লে চলবে না। এই বিষাদ যেমন সত্য,তেমনই তাকে অতিক্রম করে যাওয়ার সাহসও চিকিৎসকের থাকা চাই।এই বিষয়টিকেও প্রকৃতির সঙ্গে অদ্ভুতভাবে বেঁধে ফেলেছেন লেখক---

"ডাক্তার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে,মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।নিশ্চিদ্র মেঘাচ্ছন্ন আকাশ।পৃথিবীর উপর একটা ছায়া ফেলেছে এই রাত্রিকালেও"।

..."চকিত একটু বিদ্যুতাভাস খেলে গেল সীমাহীন মেঘাচ্ছন্ন আকাশে।মৃদু গম্ভীর গর্জনে মেঘ ডেকে উঠল দূরে।অনেক দূরে।ডাক্তার মৃদুস্বরে বললে- শ্রাবণ রাত্রির একটা গান গাও।"

আর মঞ্জু গেয়ে উঠলো---

"এসো শ্যামলও সুন্দর

আনো তব তাপহরা তৃষা হরা সঙ্গসুধা

বিরহিনী চাহিয়া আছে আকাশে।"

..."সে যে ব্যথিত হৃদয় আছে বিছায়ে

তমাল কুঞ্জ পথে সজল ছায়াতে

নয়নে জাগিছে করুণ রাগিনী"...।

আর ডাক্তার চোখ বুজে ভাবলেন যদি বৃষ্টি আসে তবে সত্যিই দেশটা জুড়োবে,প্রাণটা জুড়োবে।

অতীত স্মৃতিচারণ, নস্টালজিয়া মানুষের মনে এক অন্য দেশ অন্য অনুভূতির সৃষ্টি করে। স্বাভাবিকভাবেই এই ছবি, অন্য এক দেশ,কাল ও জীবনযাপনের ছবি।আমাদের কাছে তাই-ই উপস্থিত করে যা আজ হারিয়ে গেছে। জীবনানন্দ যেমন বলেন-

"ওরা খুব বেশি ভালো ছিল না কিন্তু-আর এক স্পষ্ট জগতের অধিবাসী ছিল।"সেই ছবির শশীর মধ্যে দিয়ে আঁকেন লেখক -

সেকালের জল টলমল দিঘী, ধান ভরা খেত-খামার, শান্ত পরিচ্ছন্ন ছায়াঘন গ্রামগুলি, লম্বা-চওড়া দশাসই মানুষ, মুখে মিষ্টি কথা, গোয়ালে গাই, পুকুরে মাছ, উঠোনে মরাইয়ে ধান,ভাঁড়ার জালায় জালায় চাল,কলাই মুগ মুসুর ছোলা অড়হর মাসকলাই, মণ মণ গুড়-সেকাল-সে দেশ দেখতে দেখতে যেন পাল্টে গেল"।

শুধু রেবা শিপ্রা উজ্জয়িনীর দেশ সময় কাল হারিয়ে ফেলেছি তাই-ই নয়,অতি সম্প্রতি আরও এক সমৃদ্ধময় কাল যেন আমরা হারিয়ে ফেলেছি।

জীবন মশাইয়ের ডাক্তার এই জগত ছিল অনেক বেশি বিস্তৃত। সঙ্গীত সাধনা, সংকীর্তন,মহান্তকে তিনি নিয়ে এসেছেন খোলা আকাশের নিচে ।গাঁয়ের লোকের সঙ্গে তিনিই প্রথম উচ্চারণ করেছেন হরিনাম।একদিকে অধরা মঞ্জরী, অন্যদিকে আতর বউ-সঙ্গে রোগীদের মৃত্যুকে নিয়ে দিনরাত ভাবনা। তাই-ই প্রতিফলিত হয়েছে এক সন্ধ্যায়। প্রকৃতির তার মধ্যে অন্য এক ভাবনার জন্ম দিয়েছে-

"সময়টা ছিল সন্ধ্যা। আকাশে মাথার ওপরে ছিল একাদশী দ্বাদশীর চাঁদ। জ্যোৎস্না ফুটি ফুটি করছে। স্থানে স্থানে গাছপালা ঘন বাড়ির ছায়ার মধ্যে অন্ধকার সেখানে গাঢ় হয়েছে সেই সব স্থানে ফাঁকে ফাঁকে বেশ স্পষ্ট হয়ে ফালি ফালি ধোয়া কাপড়ের মত এসে পড়েছে। কোথাও কোথাও মনে হচ্ছে ধোয়া কাপড় পড়ে কেউ যেন রহস্যময়ী আড়ালে গোপনে দাঁড়িয়ে সংকেত জানাচ্ছে"।

এই ছায়া দেখেই চমকে উঠেছিলেন জীবন মশায়। তার মনে পড়ে গিয়েছিল মঞ্জরীকে।

বনবিহারীর বেদনা নীলকণ্ঠের মত ধারণ করতে হয়েছে জীবন মশায়কে। হাজির ছেলের সান্নিপাতিক জ্বর এর জন্য রাতে যেতে হয়েছিল তাকে। তার আগে তিনি জেনেছিলেন বনুর নিশ্চিত মৃত্যুর কথা। আতর বউকে বলেছিলেন এবার বুক বাঁধতে হবে। বনবিহারী মৃত্যু ভয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। অন্ধকার রাতে ধানক্ষেতের পথ ধরেছিলেন জীবন মশায়। ঘুমের ঘোরে।রাত্রের অন্ধকারে দু'পাশে ধানের ক্ষেত সব মুছে গিয়েছিল মন থেকে। মাঝেমধ্যে কেবল নক্ষত্র ঝলমল আকাশের দিকে চোখ চলে যাচ্ছিল। তারপর আবার নেমে এসেছিল দৃষ্টি। হাজির নাজির ক্রাইসিস কাটবে। কিন্তু বনবিহারীর কথা মনে পড়তেই অবসন্ন মনে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভগবানের কাছে তার মঙ্গল কামনা করছিলেন। সব জেনেও। তার এই মনোবেদনার আশ্চর্য দ্যোতক হয়ে উঠেছে প্রকৃতি---

"পূর্ব দিগন্ত থেকে পান্ডুর জ্যোৎস্নাকে গ্রাস করে অন্ধকার সম্প্রসারিত হচ্ছে। দূরের গ্রামান্তর অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে অন্ধকারে ঢাকা পড়েছে"।

"ঠিক রোগীর দেহে মৃত্যু লক্ষণ সঞ্চারের মতো, নখের কোণ নীল হয়ে উঠছে,হাতে পায়ের তালুর পান্ডুরতা ক্রমশ সব দেহে ব্যাপ্ত হচ্ছে"।

বনবিহারীর মৃত্যু জীবনের গুরুতর আঘাত। কিন্তু পিতার কাছ থেকে শেখা ধৈর্যের কথা শিক্ষার কথা তাকে সহজে ব্যাকুল করতে পারেনা। তার সেই বিষণ্ণতাকে ভাষা দিতে তারাশংকর যে প্রকৃতির প্রতীককে বেছে নিয়েছেন তা অনন্য সাধারণ-

"মশায় সেদিন শেষ রাত্রির আকাশের দিকে তাকিয়ে একা দাঁড়িয়ে ছিলেন আরোগ্য-নিকেতন এর দাওয়ার উপর। উত্তর-পশ্চিম কোণে কালীতলা, দাওয়ার পাশেই কুয়ো, করবীর গাছ দুটো ফুলে ভরা সামনে শিশির ভেজা,ধুলোয় ভরা নিথর পথ খানা পড়ে ছিল। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা গুলিকে দেখছিলেন, কোথায় কোন তারা?কোথায় সপ্তর্ষিমণ্ডল?অরুন্ধতী কোথায়? ধ্রুব? ধ্রুবতারা গেল কোথায়?কালপুরুষ? পূর্ব দিগন্তে তখন দন্ড দুয়েক আগে চাঁদ উঠেছে।কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশীর চাঁদ তাদের মতো ক্ষয় রোগগ্রস্থ চাঁদ,পান্ডু বিবর্ণ,ক্ষয়িত কলেবর,পাঁচ ভাগের চার ভাগ ক্ষয়ে

গিয়েছে,ক্লান্তির আর পরিসীমা নাই যেন। জ্যোৎস্নাও ম্লান।আকাশে ছড়িয়ে আছে কিন্তু তাতে আকাশের দ্যুতি খোলে নাই। নীলিমার মধ্যেও যেন পান্ডুরতার ছায়া পড়েছিল"।

সেদিকে তাকিয়েই শশাঙ্কের বউয়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল জীবন দত্তের। তাকিয়ে ছিলেন তাদের গলি পথের দিকে। সেদিনও সেখানেই জোৎস্নার একফালি মলিন থান করা একটা বিষন্ন নারীমূর্তি দেওয়ালের গায়ে লিখেছিল। কিন্তু সেদিন শশাঙ্কের স্ত্রী বা মঞ্জুরি বলে ভুল হয়নি তার। কোন বিহারীর মৃত্যুর এই পশ্চাৎপট তারাশংকর যোগ্য ভাবেই প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। মানুষ বড় অসহায় রঙ্গলাল ডাক্তারি কথা বলেছিলেন। বিধির কাছে মৃত্যুর কাছে মানুষ সর্বদাই অসহায়। এমনই অসহায় তার চিত্র উপন্যাসের সর্বত্র দেখা যায়। যেখানে রোগ এবং রোগী সেখানে এমন এক প্রতিবেশ রচনা করেছেন লেখক যা পাঠককেও ভয়াবহ সত্যের মুখে দাঁড় করায়। তা অনেক সময় প্রকৃতির সঙ্গেই মিশে যায়। অহির নাতির অসুস্থতায় এমনই এক প্রতিবেশী রচনা করেন লেখক-

"ঘরের লোক গুলির মুখে ভাষা নাই, উৎকণ্ঠায় ভাষা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে, নিস্পলক আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে।নিশীথ আকাশের তারার মতো জেগে রয়েছে। অসহায় গ্রহ উপগ্রহ সব অসহায়। তারা তাকিয়ে দেখছে একটি নবজাতক গ্রহ বিচিত্র কারণে নিভে যাচ্ছে"।

কখনো প্রকৃতি আর মৃত্যু উপমা রূপকে জীবনের ভাবনায় একাকার করে দিয়েছেন লেখক। অতসীর ছেলেকে নিয়ে ভাবতে গিয়ে কালবৈশাখীর সঙ্গে তার মিশ্রিত রূপ জীবনের উপলব্ধি ভয়ঙ্কর----

"...নিষ্ঠুর ব্যাধি টা দেখা দিয়েছে কালবৈশাখী ঝড়ের মতো। এক বিন্দু কালো মেঘে যার আবির্ভাব সে কিছুকালের মধ্যেই ফুলে-ফেঁপে ছেয়ে ফেলবে, ফেলতে শুরু করেছে। তান্ডব এখনো শুরু হয়নি। তবে খুব দেরি নেই। নাড়ী ধরে তিনি বাতাসের সোঁ সোঁ ডাকের মতো ডাক যেন অনুভব করেছেন। দূরের প্রচন্ড শব্দের ধ্বনি যেমন মাটিতে অনুভব করা যায়, ঘরের দরজা জানলা হাত দিয়ে স্পর্শ অনুভব করা যায়,

তেমনভাবেই অনুভব করেছেন। গতি তার উত্তরোত্তর বাড়বে। ঝড়ের সঙ্গে মেঘের মতো জ্বরের সঙ্গে বিষ জর্জরতাও বাড়বে"।

আর মহামারি কে দাবানলের সঙ্গে তুলনায় পরিস্থিতি আরো জীবন্ত হয়ে উঠেছে-

"...সেই অন্ধ বধির পিঙ্গলকেশীনি দুই হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে, মহাকালের ডমরুতে বেজেছে তান্ডব বাদ্য---তারই তালে তালে উন্মত্ত নৃত্যে আত্মহারা হয়ে ছুটে চলেছে সব মৃত্যু ভয়ে ভীত মানুষ,আগুন লাগা বনের পশু পাখির মতো আর্ত কলরব করে ছুটে পালাচ্ছে। ছুটে পালাচ্ছে পিছনের লেলিহান শিখা বাতাসের ঝাপটায় মুহূর্তে নিয়ে দীর্ঘায়িত হয় তাকে গ্রাস করছে---আকাশে পাখি উড়ে পালাচ্ছে-আগুনের শিখা লকলক জিহ্বা প্রসারিত করে তাকে আকর্ষণ করছে---পাখির পাখা পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে-অসহায়ের মতো পড়ছে আগুনের মধ্যে"।

আবার পরাণ কাহারের সঙ্গে অনিবার্য কারণ এর ফলে সাক্ষাতের জন্য বৃষ্টির বর্ণনা দিয়েছেন লেখক।যা উপন্যাসে খানিকটা বৈচিত্র এনেছে-

"তাই দাঁড়িয়ে ছিলেন; মসীবর্ণ মেঘ থেকে শিল ঝড়ছিল অজস্র ধারে, বিচিত্র সে দৃশ্য। লাখে লাখে শূন্য মন্ডল টা পরিব্যপ্ত করে ঝরঝর করে ঝরছিল।সবুজ পৃথিবী সাদা হয়ে যাচ্ছিল।অনেককাল এখন শিলাবৃষ্টি হয়নি।মশায়েরা ভাবছিলেন মাঠে আজ কত জীবজন্তু জখম হবে,মরবে।আবার পৃথিবী বাঁচল।শান্ত হলো,শীতল হলো।"

জীবন মশাই চিকিৎসা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। কিশোরের অনুরোধে আবার শুরু করলেন চিকিৎসা। বের হলেন কলেরার চিকিৎসা করতে। বৃষ্টির সময় পরান কাহারের কুঁড়ের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তার চিকিৎসা সংযোগ সাধন হলো। ফলে তার খ্যাতি আবার বৃদ্ধি পেল। সুতরাং এই বৃষ্টির বর্ণনা কেবল বর্ণনাই নয় উপন্যাসের ঘটনা ধারার সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত।

ঘন ঘন অসুস্থতা,ঘন ঘন মৃত্যু, রোগ,রোগের চিকিৎসা চিকিৎসকের মধ্যেও মনোবেদনা বা মনোবিকার জাগায়,তারও দুটি চিত্ররূপ আছে উপন্যাসে। বাবার সাথে নাড়ী পরীক্ষা

বিদ্যায় একটি মেয়েকে দেখতে গিয়েছিলেন জীবন। মেয়েটিকে দেখে নিশির ভাইঝির কথা মনে পড়ে গিয়েছিল জীবনের। নিশির ভাইঝির মৃত্যুদিন বিপিনের মৃত্যু তখনো তার প্রভাবের ছায়া গুটিয়ে নেয় নি জীবন মশায়ের মনে দেখা দিল। মনে হল অন্ধকার রাত্রি ছায়ামূর্তির মত কে যেন তার মনশ্চক্ষু সামনে দাঁড়ালো। মঞ্জরীর সাথে মিল খুঁজে পেলেন তিনি। মঞ্জরীর মৃত্যুর অলৌকিক ভাবনা তাড়া করে বেড়িয়েছে জীবন দত্তকে। মনে হয়েছে মঞ্জরি বোধহয় মরেছে। মাঝেমধ্যে নির্জন অবসরে এমনভাবে চকিতের মত সে ভেসে উঠে আবারও মিলিয়ে যায়। প্রদ্যোত ডাক্তারেরও একলা নিস্তব্ধ ভাবনায় ডুবে যাওয়ার প্রতিবেশ রচিত হয়েছে। হাসপাতালের কম্পাউন্ডে প্রদ্যোত ডাক্তারের বারান্দার আলো জ্বলছে।প্রদ্যোত চুপ করে বসে আছে।হয়তো কিছু ভাবছে।আসলে ডাক্তার মাত্রই যে ভাবে। পরানের বিবির সঙ্গে জীবন দত্ত হাসপাতাল এলেই সেখানে তার জীবনের দৃষ্টিতে রচিত হয় এক অপার্থিব অতিলৌকিক অজাগতিক ভাবনার প্রতিবেশ-

"শেষ রাত্রির আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি বসে রইলেন। আকাশের নক্ষত্রদের স্থান পরিবর্তন ঘটছে।কালপুরুষ অনেকটা সরেছে।বৃশ্চিকের বাঁকা লেজের ডগায় ওই দেখা যাচ্ছে।সপ্তর্ষিমণ্ডল পাক খাচ্ছে।ওই বশিষ্ঠের নিচে অরুন্ধতী।অরুন্ধতী যে দেখতে পায়,সামনে অন্তত আরও ছয় মাস পরমায়ু নাকি নিশ্চিত।আরও ছমাস তিনি তাহলে নিশ্চয় বাঁচবেন।"

তারপর হঠাৎ তার মনে হল, "যদি তিনি বিষ খান এই মেয়েটার মত তাহলেও কী বাঁচবেন? হাসপাতালে লম্বা ঘর তার মধ্যে থেকে মৃদু আলোর আভাস বেরিয়ে আসছে। রোগীরা ঘুমুচ্ছে। তন্দ্রার মধ্যে কেউ কেউ অসুখে এপাশ-ওপাশ করছে। আশেপাশে কোয়ার্টার্সগুলি নিস্তব্ধ। অন্ধকারের মধ্যে ঘন কালো ছবির মত দেখাচ্ছে। পরিত্যক্ত কবরস্থানের মাঝখানে বটগাছের পত্রপল্লব এর মধ্যে বাতাসের বেগে সর সর শব্দ উঠছে এক টানা। হঠাৎ পায়ের তলায় পট করে একটা শব্দ উঠলো: এঃ একটা ব্যাঙ"।

- "কে?একটা সাদা কাপড় পরা মূর্তি, হাসপাতালের বারান্দার উপর।মশায় জিজ্ঞাসা করলেন-কে? নারীমূর্তি একটি।

মৃদুস্বরে উত্তর এলো-আমি একজন নার্স।আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে?বসুন।

---নাঃ,বেশ আছি।কেমন আছে মেয়েটি?

---ভাল না।

---নারায়ন হে গম্ভীর স্বরে আবার ডাকলেন মশায়। নার্স টি চলে গেল ঘরের মধ্যে। ব্যাগটা তার পায়ের চাপে ফেটে পিষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিচিত্র। তিনিই হলেন এই মুহূর্তের মৃত্যুর দূত। কোথায় নেই মৃত্যু?কিসে নেই মৃত্যু?"

কিন্তু একথাও সত্য উপন্যাস জুড়ে মৃত্যুর ছায়া মনে মননে প্রকৃতিতে প্রতিবেশে মিশে থাকলেও শেষ পর্যন্ত মরন জয় করে মঞ্জুর সুস্থতা উপন্যাসের সবচেয়ে সুন্দরতম অংশ। বোঝা যায় উপন্যাস মৃত্যু গহ্বর থেকে জীবনের আলোর দিকে এগিয়ে আসছে। মঞ্জু সুস্থ হবে, আয়ুর্বেদ আর অ্যালোপ্যাথির সন্ধি হবে, বদ্ধ মন মুক্ত হবে---

" বৈশাখের আকাশ। গতকাল দুপুরের দিকে সামান্য একটু ঝড় বৃষ্টি হয়েছে। আকাশে আজ ধূলি মালিন্য নাই। নক্ষত্রমালা আজ ঝলমল করছে। সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন জীবন মশায়। এমন অবস্থায় মন যেন ফাঁকা হয়ে যায়। কোন কিছুতেই দৃষ্টি আবদ্ধ করে না রাখলে মন ছুটতে শুরু করবে"।...

"আকাশের ঝলমলানির মধ্যে মন হারিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে বেঁচেছে"।

মৃত্যুময় মৃত্যুর রহস্যময় উপন্যাসে প্রকৃতি ও প্রতিবেশ অন্যতম ভূমিকা পালন করেছে। লেখক প্রকৃতি ও প্রতিবেশকে উপন্যাসের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে অদ্ভুত দ্যোতনায় উজ্জ্বল করেছেন। কখনো তার মধ্যে রয়েছে রহস্যময়তা,অলৌকিকতা আবার কখনো মনোবেদনা, মনোবিকার । পাঠক পাঠকালে তাকে হৃদয়ের সঙ্গে জুড়ে নিতে পারে এবং বিষয়কে ছাড়িয়ে তা যেন জীবনের গভীর রহস্যের মধ্যে ডুব দেয়।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১. আরোগ্য নিকেতন উপন্যাসটি কবে কোথায় প্রকাশিত হয়?

উত্তর- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসটি ১৩৫৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।তার পূর্বে "সঞ্জীবন ফার্মাসী" নামে ১৩৫৯ এর শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

২. উপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয় দাও দু চার কথায়।

উত্তর-বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে কুলীন ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন তারাশঙ্কর। পরবর্তীকালে উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি ভর্তি হন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ এবং চলে আসেন কলকাতায়।কিন্তু কলেজের পাঠ শেষ না করেই তিনি আবারও গ্রামে ফিরে আসেন এবং বিপ্লবী দলের সাথে সংস্পর্শ থাকায় পুলিশের দৃষ্টি ছিল তার ওপর। গ্রামে সমাজ সেবার কাজ শুরু করেন এবং তারপর ১৯৩২ সালে কলকাতায় আসেন তিনি।তারপর সাহিত্যকে জীবিকা করে লিখে চলেন একটার পর একটা লেখা।অজস্র উপন্যাস এবং গল্প গ্রন্থ লিখেছেন। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। জীবনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন ধরনের মানুষকে তিনি তার উপন্যাসে তুলে এনেছেন।তিনি একজন সফল শিল্পী এবং জীবনের পূর্ণতা সন্ধানের সন্ধানী।

৩. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের কিছু বৈশিষ্ট্য অতি সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের ব্যাপক অভিজ্ঞতায়,অজস্র বিচিত্র- সরল-জটিল-প্রতিষ্ঠিত- অবহেলিত মানুষের চরিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর উপন্যাসে। তার প্রায় সব উপন্যাসের পটভূমি তাঁর নিজের অঞ্চল রাঢ়। এখানকার মানুষদের তিনি খুব কাছ থেকে চিনতেন এবং জানতেন।সেইসব মানুষগুলোর দিনযাপন, জীবন চারণ,তাদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য,তাদের সংকট,তাদের শ্রেণী-সংগ্রাম সমস্তকিছুই তারাশঙ্করের নখদর্পণে ছিল। আর তাঁর রচনার ক্ষেত্রে তিনি সেগুলোকেই সাহিত্যের মোড়কে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো যুব পরিবর্তনের।একটি সময়ের সন্ধিক্ষণে পুরাতন এবং নবীনের দ্বন্দ্ব বারবার তাঁর লেখায় দেখা যায়।

৪. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের গঠনশৈলী সম্পর্কে অভিযোগ পাঠক মহল থেকে পাওয়া যায়?

উত্তর- তারাশঙ্করের উপন্যাস সম্পর্কে একটি অভিযোগ মাঝে মাঝেই শোনা যায়। তারাশঙ্করের উপন্যাস এর ক্যানভাস অনেক বড়। সেখানে অজস্র ঘটনা এবং অজস্র চরিত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। তারা এক সূত্রে অনেক সময় বাঁধা পড়ে না।ফলে গ্রন্থ ঐক্য নষ্ট হয় এবং সংহতি শিথিল হয়ে পড়ে। কাহিনীও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। কখনো ছোট-বড় অনেক কাহিনীকে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।যার ফলে পাঠক অমনোযোগী হয়ে পড়ে। বাইরের ঘটনা ও লোকজনের ভিড় অনেক বেশি থাকে গভীরতার চেয়ে।কিছু টুকরো ঘটনা ভিড় করে মূল কাহিনীকে অযথা জটিল করে দেয় বা মূল কাহিনীর যথার্থ বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা ঘটনা চরিত্র উপন্যাসে উপস্থিত হয়ে কাহিনীকে দীর্ঘ করে দেয়। পাঠকের মস্তিষ্ক অকারণে ভারাক্রান্ত হয়।

৫. উপন্যাসের কালান্তর এর বর্ণনা লেখক কিভাবে দিয়েছেন তা লেখক এর ভাষায় লেখ।

উত্তর- "যাবেন মহানগরী থেকে শতাধিক মাইল। চলে যাবেন বড় লাইনের ট্রেনে।...জংশনে নেমে পাবেন একটি অপরিসর শাখা-রেলপথ।মাইল দশেক গিয়ে পাবেন একটি সমৃদ্ধ গ্রামের স্টেশন।চারিদিকে দেখতে পাবেন কালান্তরের সুস্পষ্ট পরিচয়।দেখতে পাবেন, একখানা ট্যাক্সি, একখানা মোটর বাস, সাইকেল রিকশা,গোরুর গাড়ি।...দেখতে পাবেন ভাঙ্গা-গড়ায় বিচিত্র গ্রামখানিতে পুরাতন-নূতনের সমাবেশ"।

১২.৬ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১.আরোগ্য নিকেতন উপন্যাসের গঠনশৈলী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করো।

২. আরোগ্য নিকেতন উপন্যাসে প্রকৃতি ও পরিবেশ কিভাবে উপন্যাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়েছে তা বুঝিয়ে দাও।

৩. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করো।

১২.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১. বাংলা উপন্যাসে কালান্তর--- সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা---শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : কালিন্দী---ড.সমরেশ মজুমদার।

৪. জনগণ নয় গণদেবতা--- অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

৫.বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা--- ভূদেব চৌধুরী।

৬. তারাশঙ্কর বিচিত্রা---বিশ্বনাথ দে (সম্পাদিত)।

একক ১৩ আরোগ্য নিকেতন- চরিত্র-চিত্রন

বিন্যাসক্রম

১৩.১ জীবন মশায়

১৩.২ প্রদ্যোত ডাক্তার

১৩.৩ রঙ্গলাল

১৩.৪ আতর বউ

১৩.৫ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১৩.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১৩.১ জীবন মশায়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যান্য উপন্যাসের মতো 'আরোগ্য নিকেতন'-এর ক্ষেত্রেও প্রচুর চরিত্র উপন্যাসে ভিড় করে এসেছে। তবে এ গল্প,এ চেতনা,এ উপলব্ধি একান্তই জীবন মশায়ের। তাই সমগ্র উপন্যাস জুড়ে তারই উপস্থিতি,তারই ক্রিয়া কলাপ ও ভাবনা। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'আমার কালের কথা'- এ লিখেছেন-

"জীবন মশায় বাস্তবে ছিলেন কি না প্রশ্ন করেছেন। ছিলেন। তাকে দেখেছি তার ওষুধ খেয়েছি। এবং যেসব রোগী ও রোগের কথা লিখেছি তার পনের আনাই সত্য। কৃষ্ণদাস বাবুর যে ছেলেটির টাইফয়েড হয়েছিল-যাতে রঙ্গলাল ডাক্তার এসেছিলেন- কিশোর যার নাম-তার বাল্য বয়সটায় আমিই কিশোর। পরের অংশ কল্পনা। রঙ্গলাল ডাক্তার সত্য কারের মানুষ। তিনি সাহিত্যিক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এর জ্যেষ্ঠ সহোদর। তাঁর Indian Herbs বা ঐ জাতীয় নামের মূল্যবান পুস্তক আছে।"

পূর্বেই বলা হয়েছে আরোগ্য নিকেতন একান্তভাবেই জীবন মশায়ের জীবন কাহিনী। সমগ্র উপন্যাস জুড়ে তার ব্যক্তিগত ও চিকিৎসক জীবনের নানা টানাপোড়েন,নানা উত্থান পতন দেখা যায়।সঙ্গে পাওয়া যায় উপন্যাসে তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রদ্যোত ডাক্তারকে। লেখক জীবন দত্তের মধ্যে দিয়ে একটা যুগকে একটা যুগের অবসান কে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এখানে জীবন দত্ত উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। স্বভাবতই তাই উপন্যাসের সমস্ত দায়ভার তার উপরই এসে পড়েছে। লেখক তাকে অবলম্বন করেই উপন্যাস এগিয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবন সামাজিক জীবন আর লেখোকের অভিসন্ধি এই তিনটি বিষয়কে প্রকাশ করার প্রকৃত অভিব্যক্তিতে জীবন মশায় সফল একটি চরিত্র সে নিয়ে সন্দেহ নেই। তারই জীবন বৃত্তের সম্পূর্ণতায় উপন্যাসে অন্য চরিত্রের আগমন। তারই ভাবনাকে বিকশিত করার জন্য নির্মিত হয়েছে যাবতীয় কাহিনী ও চরিত্র।তার চোখ দিয়েই উপন্যাসে উপস্থিত হয়েছে তারা।

সমালোচকের মতে-"ব্যক্তিত্বে,সারল্যে,জীবন প্রীতিতে,যৌবনের উচ্ছাস ও উচ্ছলতায় দার্শনিক চিন্তায়,বস্তু জগত ও ভাব জগতের অন্বয়ে, দার্শনিক সুলভ গভীর মননশীলতায়,সবান্ধব সংসারজীবনের উদ্দামতায়, আপন পেশার প্রতি অনুরাগী ও শ্রদ্ধায়, ঐতিহ্যের প্রতি আন্তরিক আনুগত্যে, আধুনিকতার প্রতি বিস্ময়ে ও বিনম্রতায়, সহনশীলতায়, ধৈর্যে, প্রয়োজনীয় নিরাসক্তি ও উপেক্ষায়, কর্তব্যকর্মে অবিচল নিষ্ঠায়, চিকিৎসক বৃত্তির প্রয়োজনীয় স্থৈর্য কাঠিন্যে, সংসারের প্রতি দায়িত্বে,পিতা,স্বামীর ভূমিকায়, পুত্রের অবনত শিক্ষা গ্রহণে, মানুষের প্রতি দরাজ হৃদয়ে, অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধায়, প্রেমের ব্যর্থতায়, চিকিৎসা করতে গিয়ে, প্রাপ্ত সম্মান অসম্মান আঘাতে বেদনাহত উচ্ছ্বসিত হয়ে ও প্রয়োজনীয় সংযমে, মৃত্যুকে বিচিত্র রূপে প্রত্যক্ষ করে জীবন-মৃত্যুর হিসেব-নিকেশে, স্বজন হারানোর বেদনায় নতুন যুগের কাছে পরিচিত হয়ে নিজের কাছে ফিরে আসা, আবার মানুষের প্রয়োজনে মানুষের আহবানে সেই চিকিৎসা বৃত্তিতে ফিরে আসায়, নিজের প্রতি আস্থা ও অটুট বিশ্বাসে, দার্শনিক নির্লিপ্তিতে, নতুন যুগের স্বীকৃতিতে, আবেগে অশ্রুসজল হয়ে, কবিরাজি ও ডাক্তারের প্রয়োজনীয় সমন্বয়ে, নবীন কে পর ছেড়ে দেবার ঔদার্যে,জুয়া,সঙ্গীত,ধারের টাকা না

পেয়ে ক্ষোভে, হরিনাম সংকীর্তনে, আধ্যাত্ম ভাবনায়, বিজ্ঞানের আবিষ্কার এর বিস্ময়ে, মহদাশয়ত্বের ঔদার্যে, মানব দরদে, সবকিছুতে অনুচ্ছ্বসিত সংযমে, যৌবনের মাদকতায়, প্রৌঢ়ের প্রাজ্ঞতায়, সময়ের দাবি কে স্বীকৃতি দিয়ে, ক্ষুদ্র তুচ্ছ বিষয়কে অবহেলা করার বৃহত্বে, নিত্য অনিত্য জগত প্রবাহে নিজের যোগ্য ভূমিকায়-বস্তুত এক বহু বিচিত্র জীবন প্রবাহের মানুষ ও চিকিৎসক হিসেবে জীবন মশায় 'আরোগ্য নিকেতন' এর যেমন,তেমনই পাঠকের চেনা অচেনা জগতে তথা বাংলা সাহিত্যে একক ও অনন্য"।

অনেক যত্ন নিয়ে তারাশঙ্কর এঁকেছেন জীবন মশায় কে। এক ভালো-মন্দে মেশানো জীবন্ত মানুষ হিসেবে পাঠকের মনে জায়গা করে নিয়েছেন জীবন দত্ত।

উপন্যাসের শুরুতেই দেখা যায় গোধূলির শেষ লগ্নে বিশ্রামরত সৈনিক হিসেবে।

তার সময় এর মতই তিনিও ক্লান্ত, জীর্ণ। জীর্ণ তার আরোগ্য নিকেতন ও। একদিন যা ছিল লোকসমাগমে ভরপুর আজ তাই জনশূন্য। শুধু জীবনের বাকি অংশটা সজীব রাখতে যেন জেগে থাকে করবী গাছের দুটি লাল ফুল। সত্তর বছর বয়সী জীবন মশায় তাকিয়ে থাকেন সেদিকে। এককালের বিশাল দেহের কাঠামো কুঞ্চিত দেহ চর্মে ঢাকা। মোটা হাত মোটা পা পরনের ময়লা থান ধুতি সেলাই করা। শোভা কেবল শুভ্র গজদন্তের মত পাকা দাড়ি গোঁফ।

তবেই পরিণতির লম্বা ইতিহাস রয়েছে।কত মৃত্যু কত কান্না কত শোক তিনি দেখেছেন রোগীর জীবন অন্ত হলে ধীর পদক্ষেপে বাড়ি ফিরে এসেছেন। তিনি কুলগত বিদ্যা কবিরাজি মতে চিকিৎসা করেন। রঙ্গলাল ডাক্তারের কাছে অ্যালোপ্যাথিও শিখেছেন।তাই তিনি হাতুড়ে। ডাক্তারি পাশ করা হয়ে ওঠেনি তার।অথচ কবিরাজি অচল হয়ে যাচ্ছে বলে ডাক্তারি পড়তেই তিনি চেয়েছিলেন। স্বপ্ন দেখে ছিলেন তাকে কেন্দ্র করেই অর্থ যশ প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন তিনি।কিন্তু সে স্বপ্ন পূরণ হয়নি। যৌবনের প্রেম জেদ মাদকতা বেহিসেবী পদক্ষেপ তা চিরতরে শেষ করে দিয়েছে। আজ তাকে সবাই তোষামোদ করে বিনা পয়সায় রোগী দেখিয়ে নিয়ে যায়।এজন্য তার অবশ্য

কোনো আফসোস নেই।কারণ বাবার আমল থেকে তিনি অসহায় গরীব মধ্যবিত্ত চিকিৎসা করে আসছেন।কিন্তু এখন তিনি আর তা চান না।কারণ তিনি বোঝেন লোকে তাকে আর চায় না।হাতুড়ে ডাক্তার,পুরনো আমলের ডাক্তার বলে অবজ্ঞা করে।আর তার এই ব্যথাই বেড়ে যায় যখন প্রদ্যোত ডাক্তারের মুখোমুখি হন তিনি। আরো আঘাত পান যখন তিনি জানেন তাকে লুকিয়ে মতি তার মার চিকিৎসার জন্য প্রদ্যোত ডাক্তারকে ডেকে এনেছে।আর প্রদ্যোত তাকে মুখে মুখে জানিয়ে দিয়েছে বুড়ি বেঁচে যাবে।তাকে প্রদ্যোত মরতে দেবেন না।

তাকে মারতে হবেনা,বুড়ি নিজেই মরবে।জীবন মশায় একথা বলার পর প্রদ্যুৎ তাকে চরম আঘাত করেন- "পেনিসিলিন,স্ট্রেপটোমাইসিন এক্সরে এসবের যুগে ওভাবে নিদান হাঁকাবেন না। এগুলো ঠিক নয়। জরিবুটি সর্দি পিত্তি এসবের কাল থেকে অনেক দূরে এগিয়ে এসেছি আমরা। তাছাড়া এসব হল ইন হিউম্যান-অমানুষিক"। বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা যখন সম্ভব তখন হাতুড়ে চিকিৎসা ফলানো মারাত্মক অপরাধ। অন্য দেশ হলে শাস্তি হত জীবন মশায়ের।এই আঘাতে স্তব্ধ-স্তম্ভিত হয়েছেন জীবন মশায়। ক্ষণিকের জন্য হয়ে পড়েছেন বিমূঢ়। কিন্তু অসংযম, ক্রোধ,কটুক্তি তিনি করেননি। আগেও অনেক ডাক্তার এসেছেন এবং তাকে অবজ্ঞা করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়েছেন তিনিই সঠিক। কিন্তু এবার অভিমানী জীবন মশায়ের মনে হয়েছে আর নয়। তিনি চিকিৎসা জগৎ থেকে বিদায় নিতে চান।

মকবুলকে তিনি জানিয়েছেন তারা যেন আর তার কাছে না আসে। প্রদ্যুৎ ডাক্তার জানেনা মশায়ও তারই আধুনিক ডাক্তার হতে চেয়েছিলেন । কিন্তু সে কথা জেনেও সেই আকাঙ্ক্ষা বা প্রতিভার মূল্য তার স্ত্রী আদর বউ কখনো দেয়নি। পরানের বিবিকে দেখতে গিয়ে জীবন মশায়ের মনে হয়েছে স্বামী স্ত্রীর অভিমানের মত অশান্তি আর কিছু নেই। সেই অশান্তির আগুনে তিনিও সারাজীবন জ্বলেছেন। বাড়ি ফিরে সেই লেলিহান শিখার উত্তাপ তিনি পেলেন।

আফশোস হয় তার যৌবনের দিনগুলোর বেহিসাবী পদক্ষেপের জন্য।স্কুলে সহপাঠীর বোন মঞ্জরীর প্রেমে পড়েন তিনি।যৌবনের মাদকতা,মঞ্জরীর মন জয়ের চেষ্টায় যখন তিনি প্রায় পরিপূর্ণ----তখন তিনি আবিষ্কার করলেন তার প্রতিদ্বন্দ্বীর উপস্থিতি। কিন্তু হার স্বীকার করার মানুষ তিনি নন।তার সব চেষ্টা অর্থ প্রয়াস শৌখিনতা ব্যয়িত হল প্রেমে। জমিদারের ছেলের পরিচয় দ্বারা যাতে খরচ করে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী ভূপীকে হারিয়ে মঞ্জরীকে বাসনায় মত্ত হয়ে উঠলেন। প্রবৃত্ত হলেন একদিন মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রতিদ্বন্দ্বীকে অনাকাঙ্ক্ষিত চূড়ান্ত আঘাতে রক্তাক্ত করে বাড়ি ফিরলেন। প্রেমিকার ব্যঙ্গ নিরাসক্তি হয়তো তাকে আরো বেশি জেদি করে তুলেছিল।বাড়ি ফিরে জানালেন ওখানে থাকলে যাকে তিনি আঘাত করেছেন সে হয়তো তাকে খুন করবে। তাই তিনি ওখানে আর যাবেন না।অতঃপর জীবনের প্রেমিক সত্তার বিকাশ এখানেই সমাপ্ত হল।অপমৃত্যু ঘটল তার।

তারপর পিতা তার হাতে তুলে দিলেন পঞ্চম বেদ আয়ুর্বেদ। সেখান থেকেই শুরু হলো তার আয়ুর্বেদের যাত্রা।এই পাঠ নিতে নিতে তিনি ভুলে গেলেন ডাক্তার না হওয়ার দুঃখ।এটাই তার মহৎ গুণ,তার চরিত্রের দুর্লভ দিকও বটে। সমুদ্রের ডুবুরি মুক্তোর খোঁজে গিয়ে অতলের সৌন্দর্যে যেমন মুগ্ধ হয়ে পড়ে,তেমনই তিনি ডাক্তারি অর্থ যশ প্রতিষ্ঠা সব ভুলে আয়ুর্বেদের রোগতত্ত্বের গভীর ব্যাখ্যায় ডুবে গেলেন।

কিন্তু প্রেম আর সার্থকতা আবার যেন ফিরে আসতে চাইল।আবার আবেগ স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষায় যেন থর থর করে কেঁপে উঠল যুবক হৃদয়। কিন্তু পিতা বিবাহের আয়োজন করেছেন।এই অপ্রত্যাশিত পাওয়াকে তার জয় বলেই মনে হয়েছে। মঞ্জরীর আসল চেহারা দেখতে পেয়ে বিতৃষ্ণায় মন ভরে উঠেছে। কিন্তু পরবর্তীতে সুন্দরী পত্নী আর বিবাহিত জীবনের সুখ তিনি পাননি। মানুষের কাছে সবচেয়ে কাঙ্খিত যে নারী প্রেম তা তার জীবনে অধরাই থেকে গেছে। প্রেমিকা আর স্ত্রী দুজনেই তার কাছে জীবন ও আনন্দ নয় ব্যাধি আর মৃত্যুর রূপ নিয়ে বারবার ফিরে এসেছে। আতর বউকে তার জীবনের ছদ্মবেশিনী মৃত্যু বলে মনে হয়েছে তার।

কিন্তু তাই বলে তিনি সন্ন্যাসী হননি। সংসার ধর্ম পালন করেছেন।পুত্র কন্যার প্রতি সাংসারিক কর্তব্যে অবহেলা করেননি।মানুষের প্রতি ও সব সময় তিনি তাঁর কর্তব্য করে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন।প্রদ্যোত এর অভিযোগ, তিরস্কার ,শাসন তাকে তার বিশ্বাসের জগৎ থেকে সরাতে পারেনি। নিজের বিদ্যার প্রতি, নিজের শাস্ত্রের প্রতি,জ্ঞানের প্রতি তার অগাধ আস্থা অবিচল থেকেছে। পাশাপাশি তিনি নিজের শরীরের প্রতি উদাসীন থেকেছেন নিজের শরীরের উপর অত্যাচার করেছেন দরকারে অদরকারে ঘুরে বেড়িয়েছেন লোকে ফিজ দিলে নিয়েছেন না দিলে চাননি। দাবা খেলেছেন জুয়া খেলেছেন গান বাজনার আসর বসিয়েছেন ওস্তাদদের সংবর্ধনা ও অনুষ্ঠান করেছেন। আসলে তারাশঙ্কর জীবন দত্তের চরিত্রে এসব উল্লেখ না করলে তাকে সেই যুগের জীবন্ত মানুষ হিসেবে আমরা পেতাম না।কিন্তু তাই বলে অনাচার ব্যভিচার তিনি করেননি। বংশের মর্যাদা রক্ষা করেছেন। বারবার আঘাত পেয়েও চিকিৎসা নেশা রোগীর প্রতি ভালোবাসা দায়িত্ব কর্তব্য তিনি ভোলেননি।কিন্তু যে নবীন, নবাগতকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন তার প্রতিনিধিই তাকে বারবার আঘাত করেছে।

জীবন মশায় বিষয়ী হতে পারেননি। বহু টাকা উপার্জন করেছেন। কিন্তু সব খরচ করে দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত দেনার দায় সম্পত্তি নিলাম করে দিতে হয়েছে। তাতেও আক্ষেপ নেই তার।এমনকি যৌবনের প্রেম,প্রেমের উন্মাদনা শখ বিলাস তার জন্যও তার কোনো আক্ষেপ নেই।যে-বয়সে যেটা মানানসই তিনি তাই করেছেন।তার মতে তাতে কোন অন্যায় নেই।

জীবন মশায়ের সময়কাল যখন ফুরিয়ে এসেছে তখন নিজের নাড়ী ধরে তা স্পষ্ট অনুভব করেছেন তিনি। ভেবেছেন সে কি পিতা? বনু? সেকি আতর বউ? বা মঞ্জরী! পরিশেষে সেই মঞ্জুরি তার মৃত্যুদূত হয়ে দেখা দিয়েছে। জীবন মশায় বাংলা সাহিত্যে অনন্য। তার জীবন জিজ্ঞাসা জীবন ধারা প্রতিটি মানুষের জিজ্ঞাসাই যেন। জীবনে যৌবনে উচ্চশিক্ষায় মানবতায় দার্শনিক ভাবনায় কর্মযোগী জীবনে আরাধ্য কাঙ্খিত এক মানুষ হয়ে উঠেছেন।

১৩.২ প্রদ্যোত

আরোগ্য নিকেতন উপন্যাসে প্রাচীন ও নবীন এর যে দ্বন্দ্ব সেখানে নবীনের প্রতিনিধি প্রদ্যোত ডাক্তার। মূলত দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে চিকিৎসা পদ্ধতি ও প্রকরণ নিয়ে। জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি ও তাই পৃথক হয়েছে। জীবন নিয়ে ভাবনায়ও এই পার্থক্য অনিবার্যভাবে উপস্থিত হয়েছে। যদি আমরা দেখেছি উপন্যাসের সংঘাতের সামান্য পরিমাণ জায়গা আছে। অভিমানী জীবন মশায় কার্যত নবীন প্রজন্ম ও তার চিকিৎসা পদ্ধতিকে মেনে নিয়েছেন প্রথম থেকেই। আর প্রদ্যোত প্রাচীন এর বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াই চালিয়েও শেষপর্যন্ত তারই শরণাপন্ন হয়েছে। অবশ্যই তাই কথা প্রমাণ করে না যে তার নবীনতা বিফলে গেছে। প্রদ্যোত ডাক্তাররা জীবন মশাই এর কাছে হেরে যান না। তাদের ভূমিকায় সমাজের গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। হয়ে উঠতে থাকে। কেননা যুগ তাদের পক্ষে। তাদের হাতে বিজ্ঞান তুলে দিয়েছে মাইক্রোস্কোপ জীবাণু এ্যানাটমী ভ্যাকসিন স্যালাইন ইনজেকশন প্যাথোলজি। আর অজস্র নতুন ওষুধ। সুতরাং আন্তরিকতার যতই অভাব থাকার বহিরাবরণ না থাকলেও তাদের যত্নিষ্ঠ প্রয়োগ কোন কিছুই অসত্য হয়ে যায়। বরণ নবীন যুগের নবীন দূত হিসেবে তারা মানুষের কাছে উপস্থিত হন। প্রাচীন এর আবর্জনা সরিয়ে পুড়িয়ে নবীনের কল্যাণকামী বিজ্ঞানমনস্ক দান তারা মানুষের কাছে পৌঁছে দেন।

শুরুতেই প্রদ্যোত কে আমরা যে ভূমিকায় দেখি তাতে তার তারুণ্যের ভাবে, বিজ্ঞানের সমৃদ্ধি, নতুন কিছু করার বাসনা,নবলব্ধ জ্ঞানের উপছে ওঠা প্রাচুর্য,মানব সেবার প্রতিজ্ঞা,বিজ্ঞানকে সকল মানুষের কাছে পৌছে দেবার অদম্য অক্লান্ত প্রয়াস, জড়িবুটর অবৈজ্ঞানিক থেকে মানুষকে রক্ষা করে তাকে যথার্থ চিকিৎসা পরিষেবা দান, সুস্থ করে সুন্দর জীবন দান, জীবন দান করতে না পারার অস্থিরতা,সীমাবদ্ধতা ও যন্ত্রণা নবীন যুবক শ্রমনিষ্ঠ, আত্মপ্রত্যয় সব নিয়ে তিনি যেন আবির্ভূত এক দেবদূত। এই নতুনের স্পর্শে মানুষকে নবজীবন দান গঠন শীলতা দেশকে আধুনিক করে গড়ে তোলার আকাঙ্খা প্রবল হয়ে উঠেছে। আর কে না জানে এই নবীনতা ও প্রাবল্য সবসময়ই হয় বেহিসেবি আবেগ বহুল অস্থির। সে সবকিছুকে ভাঙতে চায়, সব প্রাচীনতা কে খারাপ

মনে করে অস্বীকার করে মুছে ফেলতে চায়। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে আনন্দ পায়। আত্মপ্রত্যয় অটল নব সৃজনে অস্থির থাকে।

এই জেহাদ ও সজীবতা তারুণ্যের উচ্ছ্বাস ও শপথ নিয়ে উপন্যাসে প্রদ্যোত ডাক্তারের আবির্ভাব ঘটে।

"তরুণ বয়স, পরনে প্যান্ট , বুশ শার্ট এর উপরে ওয়াটারপ্রুফ,মাথায় অয়েল স্কিলের ঢাকনি মোড়া শোলার হ্যাট,চোখে শেলের চশমা, কলকাতার অধিবাসী" ।মতির মাকে দেখে সাইকেলে ফিরছিলেন তিনি।জীবন মশায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে জীবন তাকে নমস্কার করেন এবং সেও প্রতি নমস্কার করে কুশল বিনিময় করেছেন।মতির মায়ের প্রসঙ্গে জানিয়েছেন এক্সরে করতে হবে।ভেতরে কোথাও হাড়ের কুচি থাকলে অপারেশন করতে হব। মারাত্মক কিছু নয় তবে ব্যবস্থা হলেই সেরে যাবে।তার মুখে থাকে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি ।বলাবাহুল্য এ সোজাসোজি জীবন মশায় কে, তার নিদানের বিদ্যা কে ব্যঙ্গ করা। কেননা এর আগে মতির মাকে দেখে জীবন নিদান দিয়েছিলেন গঙ্গা যাত্রার ব্যবস্থার।তিনি বলেছেন সার্জারি তিনি জানেন না।জানেন নাড়ী। এই নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন প্রদ্যোত এবং সোজাসুজি যুদ্ধজয়ের শপথ নিয়ে বলেছেন---"ওকে মরতে আমি দেবনা" ।প্রদ্যোতের প্রতিটি কথাই যথার্থ। তবু তিনি একক ব্যক্তি হিসেবে জ্ঞান-গরিমা ও যুদ্ধের অহংকার কে সজোরে ব্যক্ত করেছেন। অস্বীকার করেছেন ঐতিহ্যকে তার দেশের আর্থসামাজিক ব্যবস্থাকে পিছিয়ে পড়া সমাজ ব্যবস্থাকে সামন্ততন্ত্রের নিগড় কে। অবশ্য ধীরে ধীরে উপন্যাসে পরিণত হয়েছেন তিনি। একদিন স্বীকার করেছেন ঐতিহ্য ও প্রাচীন কে। বুঝেছেন তাদের অক্ষমতা ও অসহায়তাকে।

নবীন তরুণ সমাজের যথার্থ মঙ্গলকামী মানুষের সুস্থতায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ডাক্তার মনে রাখেন নি সংঘাতটা তার হওয়া উচিত পিছিয়ে থাকা গ্রামীণ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। উন্নত উজ্জ্বল সমাজব্যবস্থা যেখানে মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে যায় সুচিকিৎসা সেখানে জীবন দত্তেরা গুরুত্বহীন হয়ে যান। কোথাও কোন দরখাস্তের প্রয়োজন হয়না। তবু বলা যায় "ধর্ম যতদিন দুঃখী মানুষকে বেঁচে থাকার সাহস দেয় ততদিন রাস্তা

নিয়ে কারো সাথে বিরোধ থাকেনা"। তাই প্রদ্যোৎ অস্বীকার করলেও তিনজন ডাক্তার জীবন মশায়ের অনিবার্য গৌরবময় ভূমিকার কথা মেনে নিয়েছেন। চালু ডাক্তার প্রদ্যোৎ এর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে বলেছেন প্রদ্যুৎ সমাজ সেবার জন্য এবং চিরদিনের জন্য এখানে আসেননি। নিজেকে বিকাশ করার দামি সুযোগ পেলেই তিনি একদিন এখান থেকে চলে যাবেন। তাই অহেতুক বৃদ্ধের উপর রাগ করা তাকে মানায় না। উচ্চারণ করেছেন সেই পরিচিত উক্তি --- "শতমারি ভবেদবৈদ্য সহস্রমারি চিকিৎসক"। হাতুড়েরা মানুষ মারে মানুষের উপকারও করে জীবিকা নির্বাহও করে। এই অভিযোগে অনেকের অন্ন উঠবে।

এই কথায় প্রদ্যোত ডাক্তার নরম হয়েছেন,খানিক লজ্জিতও বোধ করেছেন। তাই চারুবাবুর কথায় সায় দিয়ে তিনি অনুরোধ করেছেন চারু বাবু যেন বৃদ্ধকে একটু সাবধান করে দেন। এসব ভালো নয়। এ অতি নিষ্ঠুর এবং আনসাইন্টিফিকও বটে। হাত থেকে নাড়ী পিত্ত কফ নিদান এগুলো ঠিক নয়। উল্লেখ্য চারুবাবুর কার্যত স্বীকার করেছেন একসময় লোকটার নিদান আশ্চর্যরকম ফলে গেছে। মতির মায়ের ব্যাপারেও সাবধান করে বলেছেন ওকে কলকাতা বা বর্ধমান না পাঠালে বুড়োর নিদান ফলে যেতে পারে। দুরন্ত যোদ্ধা প্রদ্যোৎ অবশ্য আত্মবিশ্বাসের সুরে বলেছেন 'যাবেনা'।"হি মাস্ট প্রুভ হিমসেলভ-প্রমাণ সে করবেই। উইচক্রাফটের মত এই হাতুড়ে বিদ্যের ভেলকি ভেঙে সে দেবেই। জীবনে তার মিশন আছে। শুধু অর্থ উপার্জনের জন্য সে ডাক্তার হয়নি"।একথা সত্য। সমগ্র উপন্যাস জুড়ে তার এই ভাবনা আন্তরিকতা দরদ প্রয়াস এর ভূমিকা ছড়িয়ে আছে।

ব্যক্তিগত জীবন চারণের মধ্যেও তার বিজ্ঞানমনস্ক তার পরিচয় মেলে। যদিও ডি ডি টি ক্যাম্পেইনের ফলে মশা কমেছে তবু প্রদ্যোৎ বিনা মশারিতে শোন না। চারপাশে ফ্লিট স্প্রে করা। বারান্দার নিচে সিঁড়িতে কার্বলিক অ্যাসিড ভেজানো খড় থাকে এবং ব্লিচিং থাকে। সাপ পোকা বিছে যাতে আসতে না পারে।

প্রদ্যোৎ ডাক্তার জীবনের পূজারী।জীবনকে ভালোবেসেছেন।উপযুক্ত শিক্ষা ও সেবায় তাকে নবজন্ম দিতে চেয়েছেন। মৃত্যুকে ঘৃণা করেছে তার নবশিক্ষা নবযৌবন ও প্রাণের উচ্ছ্বাস। তাই রেডিওতে 'মরণরে তুঁহু মম শ্যামসমান' গান বাজলে বন্ধ করে দেন। এই মুহূর্ত টি শিল্পী তারাশঙ্কর অসাধারণ ভঙ্গিমায় তুলে ধরেছেন। কর্তব্য কর্মে প্রদ্যোত নবীনের মতোই তৎপর ।প্রতিটি অসুখ, অসহায়তা যেন তার শত্রু ।তাকে তখনই যুদ্ধে নামতে হবে তাদের বিরুদ্ধে।

প্রাচীন এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই নতুনের পথ নির্মাণ করতে হয়। উপন্যাসে এ দায় বর্তেছে প্রদ্যোত এর উপর। সেদিন তারাই হয়ে উঠেছিলেন নতুন ভারত গড়ার কারিগর।শুধু জীবন মশায়দের থামানোই নয়,তৈরি করতে হবে যোগ্য চিকিৎসার উপযুক্ত চিকিৎসালয়। তা তৈরি হচ্ছে,প্রদ্যোতের চোখে স্বপ্ন আনন্দ আশা উপছে উঠছে।নির্মীয়মান হাসপাতালের দিকে তাকিয়ে তার বৃদ্ধির নিশ্চিত প্রত্যাশায় তার মন ভরে উঠেছে।প্রদ্যোতের স্বপ্ন প্রত্যাশা সংগ্রাম ভারতবর্ষে আজও বড় প্রাসঙ্গিক-

" নতুন কাল।বিজ্ঞানের যুগ। অদৃষ্ট নিয়তি নির্বাসনের যুগ।ব্যধিকে জয় করবে মানুষ। মৃত্যুর সঙ্গে সে যুদ্ধ করবে। মৃত্যুর মধ্যে অমৃত খুঁজেছে মানুষ অসহায় হয়ে। এবার জীবনের মধ্যে অমৃত সন্ধানের কাল এসেছে।একালে অনেক আয়োজন চাই ।অনেক কিছুর আয়োজন।সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন এই লোকগুলির নির্বাসন। এই জীবন মশায়দের। নিদান। নিদান।মৃত্যুর সঙ্গে যেন একটা প্রেম করে বসে আছে এদেশ!গঙ্গার ঘাটে গিয়ে জলে দেহ ডুবিয়ে মরাই এখানে জীবনের কাম্য"।

নিদান বিষয়টিতেই সবচেয়ে বেশি আপত্তি প্রদ্যোত এর। চারপাশের মানুষ এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।জীবন যখন বলে দিয়েছেন তাহলে আর কারো কিছু করার নেই।এই ভাবনাকে সমর্থন করে না সে।

এই প্রগতি ভাবনা প্রদ্যোৎ এর ব্যক্তি জীবনেরও অঙ্গ। মঞ্জু গান গায়। প্রদ্যোৎ তাকে উৎসাহিত করেন।মঞ্জু তার কাছে মূর্তিমতী জীবনের ঝর্ণা। উচ্ছ্বসিত আবেগে সম্মুখে বয়ে চলেছে। বহু যুদ্ধ করে ডাক্তার তাকে জয় করেছেন। যদিও তার বাড়ির লোকের

মঞ্জুরীর দুলালীপনা পছন্দ নয়। ডাক্তারের এই জীবন এই গতিশীলতা এই উল্লাস উচ্ছাস ভালো লাগে। দাম্পত্য জীবনেও দুই চিকিৎসকের কত অমিল। বয়সের জন্য নয়, মনের গঠনের জন্য নয়,সময় পরিবর্তনের জন্য নয়, কেবল প্রাপ্তির জন্য।জীবন মশায়ের যা অপ্রাপ্তি থেকে গেছে প্রদত্ত তা পেয়েছেন আর তা যেন স্বাভাবিকভাবেই।

মানুষের মঙ্গলের জন্য বিনয়ের কাছে বলি না হওয়ার জন্য দরিদ্র মানুষদের খাঁটি ওষুধটি তুলে দেওয়ার জন্য প্রদ্যুৎ উদ্যোগী হয়ে অঞ্চলের পাশ করা সকল ডাক্তার কে ডেকে কো-অপারেটিভ মেডিকেল স্টোর খুলতে সমর্থ হয়েছেন। দান বা সমাজ সেবা নয়।সে কথা তিনি ভাবেনওনি।তাছাড়া সে ক্ষমতাও তার নেই। অন্য ডাক্তারদের সাহায্য নিয়ে তাই তিনি ব্যবসাই খুলতে চান। কিন্তু মানুষকে বঞ্চনা করে নয়। অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের কাছে যথার্থ ওষুধ চিকিৎসা পৌঁছে দিতে চেয়েছেন তিনি।একটা ক্লিনিক করতে চেয়েছেন।তিনি মনে করেন একালে ক্লিনিক ছাড়া চিকিৎসা করা অন্যায়।আরোগ্য নিকেতন উপন্যাসে জীবন মশায় তারাশঙ্করের নায়ক।তাই তিনি তাকে যতটা যত্ন নিয়ে যতটা মমতায় যতটা সহানুভূতি দিয়ে এঁকেছেন প্রদ্যোত এর ক্ষেত্রে ততটা মনোযোগ লেখক দেননি। চরিত্রটি তাই নায়কের গৌরব অর্জন করতে পারেনি।কিন্তু তবুও প্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক হিসেবে চরিত্রটি সার্থক হয়ে উঠেছে।

১৩.৩ রঙ্গলাল

রঙ্গলাল ডাক্তার আরোগ্য নিকেতন এর সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও জীবন্ত চরিত্র। তার জীবনের একটা দর্শন আছে যা পাঠকের মন ছুয়ে যায়। রক্তে-মাংসে জীবন্ত রঙ্গলাল চরিত্রটি। জীবনাচরণে সাধারণ। কোন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব তিনি নন। দোষে-গুণে জ্ঞানী মমতায় উদাসীনতায় ভরপুর একটি চরিত্র। রঙ্গলাল স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিকতাঃ সামাজিকতায় ও সৃষ্টিছাড়ায় আত্মশক্তিতে, বিশ্বাসে জীবন প্রেমে জীবন্ত আগে বিচিত্র। স্বল্প পরিসরে স্বল্প ঘটনায় রঙ্গলাল সহজেই আমাদের মনে জায়গা করে নেয়।

জীবন কবিরাজি বিদ্যা শিক্ষা নিয়েছিলেন পিতার কাছ থেকে। তার ডাক্তারি বিদ্যার গুরু ছিলেন রঙ্গলাল ডাক্তার। যদিও পূর্ণ শিক্ষা তিনি আয়ত্ব করতে পারেননি। একদিন

শব ব্যবচ্ছেদ করে রাত্রে বমি করেছিলেন বাড়ি ফিরে। তারপর আর সেখানে যাননি। কয়েকদিন পর আবার যখন সেখানে গিয়েছিলেন তখন একটি শিশুর মৃতদেহ দেখে নিজের মেয়ের মুখ মনে পড়ায় আঘাত পেয়েছিলেন মনে। তারপর রঙ্গলাল বুঝেছিলেন পিতা যে ধাতুতে গড়ে দিয়েছেন জীবনকে তার উপর অন্য কিছু লাগানো যাবে না। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসু গবেষক মন নেই জীবনের। আরে ইংরেজি তো সে তেমন পটু নয়। তাই এসব বুঝেই তিনি আর জীবনকে নিয়ে বেশি দূর এগোননি।

রঙ্গলাল এর জীবন কথা এবং জীবনযাত্রা বিচিত্র। কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। এমন মানুষ জন এক আধটা আমাদের চারপাশের পরিবেশে দেখাই যায়। ধরাবাঁধা জীবনের বাইরে অন্য ভাবে বাঁচার মন্ত্র নিয়ে রঙ্গলাল উপন্যাস এসেছেন। সে আপাতত রূঢ়, স্পষ্টভাষী আবেগ বিহীন আপাত অর্থে অসামাজিক মানুষ।কিন্তু তিনি স্বশিক্ষায় শিক্ষিত। আর বন্ধন ছিন্ন করতে পেরেছিলেন বলেই মিথ্যা মায়ার পাশ কাটিয়ে তিনি মানুষের উপকারে আসতে পেরেছিলেন।যদিও রোগী বা রোগীর বাড়ির লোকের সঙ্গে তার তেমন কোমল ব্যবহার ছিল না।তবুও রোগীর সামনে কখনো তিনি মৃত্যুর কথা বলেননি।কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতেন-

"মেডিসিন কেন কিওর ডিজিজ বাট ক্যাননট প্রিভেন্ট ডেথ"।

দেশে তখন ডাক্তারের প্রচলন হয়েছে। মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ডিসপেনসারি ইংরেজ সাহেব ডাক্তার দেশি নামজাদা ডাক্তারদের ভিড়। সেই সময়ে রঙ্গলাল এর আবির্ভাব।তসরের প্যান্টালুন গলাবন্ধ কোট গলার কারে ঝুলানো পকেট ঘড়ি।যাওয়ার জন্য পালকি।থাকতেন দেবীপুর থেকে চার মাইল দূরে। এ অঞ্চলে তিনি প্রথম অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা নিয়ে আসেন। কিন্তু কখনো মেডিকেল স্কুল বা কলেজে পড়েননি তিনি। পাশ করেননি। নিজে নিজে বাড়িতে অধ্যয়ন করেছেন। নদী থেকে শ্মশান থেকে মৃতদেহ সংগ্রহ করে এনে বই মিলিয়ে কেটে শারীরিক গঠন সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। তিনি সাধনা বিস্ময়কর। সে সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

তার জীবন প্রবাহও বিচিত্র। গতানুগতিক জীবনে তিনি তৃপ্তি খুঁজে পাননি। পিতার সঙ্গে মিশনারিদের সংস্পর্শে থাকা নিয়ে বিরোধ হওয়ায় একদিন কপর্দকশূন্য অবস্থায় তিনি বেরিয়ে পড়েন এবং শিক্ষকতার কাজ শুরু করেন। ইংরেজি বিদ্যায়তনে ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। তিনি ছিলেন আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ।

হঠাৎই শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে নির্জন গ্রামে শুরু করলেন চিকিৎসার সাধনা।হাতের কাছে ছিল না কোনো সহায়ক ,ছিলনা পূর্বসূরী। কেবল রাজাদের প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালের ডাক্তার এর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল।প্রায়ই তার কাছে যেতেন।হাসপাতালে ঘুরে ঘুরে রোগী দেখতেন। তার কাছ থেকে নিয়ে বই পড়তেন।রাতের পর রাত তর্ক আলোচনা চালাতেন। তারপর বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটলো।তিনি এসে পৌছলেন মুসলমান প্রধান লালমাটি গ্রামে।প্রথমে থাকলেন ভাড়া ঘরে।তারপর গ্রাম প্রান্তে নদীর কিনারায় বাংলো বাড়ি তৈরি করলেন। রাত্রে বেরোতেন পিশাচ সাধক এর মত।কাঁধে কোদাল আর চাকাওয়ালা ঠেলাগাড়ি ফিরতেন শবদেহ নিয়ে এবং দিন কয়েক মগ্ন হয়ে ঘরবন্দি থাকতেন।কাচের ছাদওয়ালা ঘর ছিল একটা।সেখানে কারোর প্রবেশ অধিকার ছিল না।ক্রমে তিনি যখন মনে করলেন তার পক্ষে রোগের এবং রোগীর চিকিৎসা করা সম্ভব তখন তিনি চিকিৎসার কথা ঘোষণা করলেন এবং অবিলম্বে প্রতিষ্ঠিত হলেন। রঙ্গলাল ডাক্তার এর পাশাপাশি অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা বিদ্যাও প্রতিষ্ঠিত হল।প্রদ্যোৎ এর মত জীবন মশায়ের প্রতি তার ক্ষোভ ছিল না।তিনি তাকে ঘাতক বলে ভাবেন নি। বরং স্বীকৃতি দিয়েছিলেন তাকে। তার সীমাবদ্ধতা আবিস্কার করার পরও।কবিরাজি মুষ্টিযোগ কোন কিছু তে তার আপত্তি বা বিশ্বাস ছিল না। তিনি ছিলেন ভীষণ রকম ভাবে বিজ্ঞানমনস্ক।কিন্তু জীবনের মধ্যে যে লড়াই করার শক্তি রয়েছে তার প্রতি ছিল তাঁর অসীম শ্রদ্ধ। বলতেন তোমাকে আমি ভালোবাসি তার কারণ তুমি জীবনে হার মাননি। এদেশের কবিরাজরা হার মেনে ঘরে বসে এ্যালোপ্যাথিকে শাপশাপান্ত করল। না পারল নিজের শাস্ত্রের উন্নতি করতে,না পারল এলোপ্যাথিতে কি আছে তা খুঁজে দেখতে।আধমরারা এমনি করেই মরে। হারা মানেই মরা।

জীবনের প্রসঙ্গেই রঙ্গলালের আরেকটি দিক আবিষ্কার হয় উপন্যাসে। আপাত রূঢ় কঠিন আচরণের অন্তরালে স্নেহপ্রবণ এক মন। যিনি প্রতিভার কদর করেন।সম্মান দেন।কবিরাজি কে অস্বীকার করেননি তিনি।আবার তার সীমাবদ্ধতা কেও চিহ্নিত করেছেন।জীবনের পিঠে হাত বুলিয়ে তিনি তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন জীবন অনুভব করেছিলেন তার স্নেহকে।

রঙ্গলাল এর মৃত্যু, স্বেচ্ছানির্বাসন,নির্জনতাকে বেছে নেওয়া,কাউকে সাক্ষাৎ না দিয়ে ঘর বন্দী হয়ে থাকা, কোন চিকিৎসা গ্রহণ না করা আমাদের মনকে ব্যাকুল করে তোলে।কিন্তু এ বিরাট মাপের আত্মবিশ্বাসী মানুষটিকে সহানুভূতির জালে আমরা আটকাতে পারি না। তার জীবন যাপনের দিকে তাকিয়ে বরং নত মস্তকে আমরা শ্রদ্ধার নত হয়ে পড়ি।

উপন্যাসের রঙ্গলালের আবির্ভাব খামখেয়ালি, বিদ্রোহী,কঠিন এক ডাক্তার এর জীবন কাহিনী দেখানোর জন্য নয়।।'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে জীবন মৃত্যু নিয়ে একটা চিরকালীন প্রশ্ন,একটা ব্যাখ্যা,জীবন পিপাসা, অনিবার্য মৃত্যু এই বিষয়ে একটা গূঢ় গভীর দার্শনিক তত্ত্ব ব্যক্ত হয়েছে।নানা ব্যক্তির নানা জীবন জীবন চর্চা জীবনবোধের মধ্য দিয়েই তা ব্যক্ত হয়েছে।রঙ্গলাল এর জীবনবোধ দর্শন আপন শক্তি ও স্বাতন্ত্র্য আরোগ্য নিকেতন এ জীবন মশায়ের ভাবনা ও দর্শন এর বিপরীত ধর্মী হয় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে।যাকে লেখকও অস্বীকার করতে পারেন না।

১৩.৪ আতর বউ

তারাশঙ্করের কোন উপন্যাসে পুরুষের তুলনায় নারী চরিত্র অধিক সার্থকতা লাভ করেনি। ব্যক্তিত্ব সামাজিক পটভূমি রাজনীতি অর্থনীতি সামগ্রিক পরিচয় তাঁর পুরুষরা যতখানি সমৃদ্ধ উজ্জ্বল এবং সামগ্রিক ততোখানি অখন্ড পরিচয় নিয়ে উঠে আসতে পারেনি। আমাদের আলোচ্য উপন্যাস ও পুরুষের তুলনায় নারীরা অনুজ্জ্বল। ব্যক্তিত্ব কর্ম বা প্রতিভা বা নিছক ঘটনাও ক্রিয়ায় নারীরা গুণগত ও পরিমাণগত ভাবে কম সক্রিয়। হয়তো সেই সমাজ কালে সেটাই প্রচলিত ছিল। তবে গুণে ও পরিমাণে

পুরুষদের তুলনায় কম ব্যবহৃত হলেও কাউকে অচেনা থাকে না। সামান্য কথায় প্রতিক্রিয়ায় তারা যতদূর সম্ভব নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পেরেছে।

আতর বউ এই উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র। গুরুত্বে মৃত্যুর চেয়ে তিনি ম্লান বটে তবে বাস্তব নারী চরিত্র গুলির মধ্যে তিনি জীবন্ত। যদিও তাকে একমুখী করেই আঁকা হয়েছে। সবসময়ই তিনি ক্রুদ্ধ,বিরক্ত। জীবন তার কাছ থেকে সহমত ও সহমর্মিতা কোমলতা ও প্রেম কিছুই পায়নি। যদিও সমকক্ষতার দাবিতে আতর বউ এর সঙ্গে তিনি বেমানান তবুও স্বাভাবিক দাম্পত্য কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু আতর বউ কখনো সে যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। জীবন ও হয়তো প্রথম আঘাতের পর এবং স্ত্রীকে চেনার পর আর সে চেষ্টা করেননি প্রেমিকাও স্ত্রীর সান্নিধ্য হারিয়ে তিনি ব্যাধি মৃত্যু নিয়ে সারা জীবন অতিবাহিত করলেন।

আতর বউয়ের এই সদা রুষ্ট ক্রোধান্বিত রুপের কার্যকারণ পরম্পরা উপন্যাসে দেখানো হয়নি। হয়তো চরিত্রগত ভাবেই তিনি এরকম। মামারবাড়িতে অনাদরে পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠা প্রতিপালিত হওয়া এবং মঞ্জরীর ঘটনা ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে যে বিরক্তি সৃষ্টি করেছিল তার থেকে তিনি বেরিয়ে আসতে পারেননি । তবে আতর বউ শাশুড়িকে মুগ্ধ করতে পেরেছিলেন।শাশুড়ির কাছে তিনি ছিলেন পয়মন্ত।জীবন বেরোনোর সময় তাকে দেখা দিতে হতো।তিনি বিশ্বাস করেছিলেন বউয়ের পয়েই জীবনের এই সাফল্য। আবার বার ব্রত করলেও আতর বউ অন্যরকম। শশীর প্রতি তার স্নেহ যত্ন খাবার পর্যন্ত বাড়িতে পাঠানো,স্বামী বাড়ি ফেরা না পর্যন্ত জেগে থাকা,মতির মায়ের কথায় ধিক্কার আবার পরে অনুতাপ প্রভৃতি ঘটনা তার চরিত্রের কোমলতাকেই প্রতিভাত করে। তবু তিনি জীবনে শান্তি পান নি। বরং বলা যায় এই উপন্যাসে যদি কারোর - ব্যথা-বেদনা দহন জ্বালা থাকে তবে তা আতর বউয়েরই।পুত্র স্বামী হারানোর দুর্ভাগ্য উপন্যাসে কেবল তারই।

তার পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক ব্যঙ্গ করে বলেছেন--- "ডাক্তার গিন্নীও সকালেই ওঠেন এবং তার বিচিত্র স্বভাবের বিচিত্রতম অংশটুকু এই প্রথম প্রভাতেই আত্মপ্রকাশ

করে থাকে।নাম তার দুর্গা।দুর্গা প্রভাতে ওঠেন যুদ্ধোদ্যতা দশপ্রহরণধারিণীর মতো। মেজাজ সপ্তমে উঠেই থাকে, সেই মেজাজে ঝকঝকে বাড়িটাকে সন্ত্রস্ত করে দিয়ে কিছুক্ষণ পরে আশ্চর্যভাবে ধীর স্থির হয়ে আসেন। ডাক্তার দেরিতে ওঠেন যেসব কারণে ওটা তার মধ্যে একটা প্রধান কারণ"।

সকালে উঠেই জীবনকে স্ত্রীর কাছে মিথ্যে বলতে হয়। চিকিৎসা ছেড়ে দেওয়ার কথা বলার পর ঘরে আছে ক্ষমা হীনা স্ত্রী।স্বামী স্ত্রী অশান্তির মতো অশান্তি আর নেই। জীবন পরান বউয়ের চিকিৎসা করতে গিয়ে সেটা বোঝেন। জীবনের প্রচ্ছন্ন বেদনা জেনেছিলেন আতর বউ। জীবনের বেদনা যেন তাকেও আক্রমণ করেছিল। ফুলশয্যার রাত্রে আতর বউ সেই আঘাত ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।জীবন যখন শেষ রাতে তাকে বুকের কাছে টেনেছেন তখন তার সে ডাকে সাড়া দেননি বরং প্রত্যাখ্যান করেছিলেন---"আমাকে দয়া করে বিয়ে করেছ।উদ্ধার করে।দাসীর মতো এসেছি,দাসীর মতো দুটো খাবো। আদর তো আমার পাওনা নয়।আমায় ছেড়ে দাও আমাকে"।

এরপর সারা জীবন একই রকম কেটেছে। আতর বউ আগ্নেয়গিরির মত একবার জেগে উঠলে আর থামেনা।

আতর বউ চিরকালের অসন্তোষ নিয়ে চলেছেন। মাথা কুটেছেন নিষ্ফল আক্রোশে। বিদ্রোহ করেছেন চিৎকার করে কেঁদেছেন।

স্বামীর প্রতি তিনি বিরূপ কিন্তু পুত্রস্নেহে তিনি নির্বিচার পুত্রের অন্যায় কে প্রশ্রয় দিয়েছেন তারই সামনে স্বামীর প্রথম জীবনের কথা তুলে তাকে আঘাত দিয়েছেন উত্তরের সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করেছেন মেলায় বনবিহারী মদ খেয়েছিল একথা জেনে জীবন থেকে তিরস্কার করেছেন তখনই আড়াল থেকে বেরিয়ে সোজা স্বামীর মুখোমুখি হয় জীবনকে আরা আক্রমণ করেছেন আতর বউ---

" একটা ভুলের জন্য এত বড় কথা বললে তুমি ওকে? আমার গর্ভের দোষ দিলে! চৌদ্দ পুরুষের মাথা হেট করেছে বললে?...তুমি নিজের কথা ভেবে দেখে কথাটা

বলছো?নিজে তুমি করোনি? ও হয়তো সঙ্গদোষে কোন ভ্রষ্টার পাল্লায় পড়ে একটা ভুল করে ফেলেছে!কিন্তু তুমি? মঞ্জরীর জন্য তুমি কি কান্ডটা করেছিলে মনে পড়ে না?"

আসলে আতর বউ বোঝেননি পুত্রের কোন সর্বনাশের দিককে তিনি বৃক্ষে রূপায়িত হতে সাহায্য করেছেন।জীবন নিদারুণ আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

এ উপন্যাস ট্র্যাজিক নয়। জীবন মশায় প্রায় সব পেয়ে, হারিয়ে যাওয়া স্বীকৃতি ফিরে পেয়ে প্রদ্যোৎ এর কাছে নিজের অভ্রান্ত নাড়ী পরীক্ষার জ্ঞানের স্বাক্ষর রেখে পূর্ণ বয়সে চলে গেছেন।পড়ে রইলেন সব হারিয়ে আতর বউ।যা কিছু দুঃখ-বেদনার অপ্রাপ্তি শূন্যতার ছায়া তা আতর বউয়ের।সে অর্থে ট্রাজেডি বলতে আমরা যা বুঝি সেই উচ্চতা, দহন কোনটাই আতর বউকে গৌরব দান করেনি। সে উচ্চতা ও যোগ্যতায় নির্মিত নন তিনি। তবুও তার বেদনা আমাদের মনে করুণা জাগিয়ে তোলে।তার সমব্যথী করে তোলে ।স্বামীর শেষ শয্যায় তার হাহাকারে লুটিয়ে পড়া---

"সেই মুহূর্তেই আতর বউ মশায়ের মুখটি ধরে বললেন ধ্যান সাঙ্গ হল? মাধবের চরণাশ্রয়ে শান্তি পেলে?আমি? আমাকে?আমাকে সঙ্গে নাও।"

"শান্ত আত্মসমর্পণের মতো তিনি স্বামীর বিছানায় লুটিয়ে পড়লেন"।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১. তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় "আমার কালের কথা" গ্রন্থে জীবনমশায়ের চরিত্র সম্পর্কে কী বলেছেন?

উত্তর- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'আমার কালের কথা'- এ লিখেছেন-

"জীবন মশায় বাস্তবে ছিলেন কি না প্রশ্ন করেছেন। ছিলেন। তাকে দেখেছি তার ওষুধ খেয়েছি। এবং যেসব রোগী ও রোগের কথা লিখেছি তার পনের আনাই সত্য। কৃষ্ণদাস বাবুর যে ছেলেটির টাইফয়েড হয়েছিল-যাতে রঙ্গলাল ডাক্তার এসেছিলেন-কিশোর যার নাম-তার বাল্য বয়সটায় আমিই কিশোর। পরের অংশ কল্পনা। রঙ্গলাল

ডাক্তার সত্য কারের মানুষ। তিনি সাহিত্যিক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এর জ্যেষ্ঠ সহোদর। তাঁর Indian Herbs বা ঐ জাতীয় নামের মূল্যবান পুস্তক আছে।"

২. আতর বউ পুত্র বনবিহারীর সপক্ষে জীবনমশাকে কি বলেছিল?

উত্তর-" একটা ভুলের জন্য এত বড় কথা বললে তুমি ওকে? আমার গর্ভের দোষ দিলে! চৌদ্দ পুরুষের মাথা হেট করেছে বললে?...তুমি নিজের কথা ভেবে দেখে কথাটা বলছো?নিজে তুমি করোনি? ও হয়তো সঙ্গদোষে কোন ভ্রষ্টার পাল্লায় পড়ে একটা ভুল করে ফেলেছে!কিন্তু তুমি? মঞ্জরীর জন্য তুমি কি কান্ডটা করেছিলে মনে পড়ে না?"

১৩.৫ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১.উপন্যাসে জীবন মশায়ের চরিত্র বিশ্লেষণ করো।

২. উপন্যাসে প্রদ্যোতের চরিত্র বিশ্লেষণ করো।

৩.উপন্যাসে আতর বউয়ের চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

১৩.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১. বাংলা উপন্যাসে কালান্তর--- সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা---শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : কালিন্দী---ড.সমরেশ মজুমদার।

৪. জনগণ নয় গণদেবতা--- অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

৫.বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা--- ভূদেব চৌধুরী।

৬. তারাশঙ্কর বিচিত্রা---বিশ্বনাথ দে (সম্পাদিত)।

একক ১৪ আরোগ্য নিকেতন- নামকরণ

বিন্যাসক্রম

১৪.১ নামকরণ

১৪.২ উপন্যাসে মৃত্যু চেতনা

১৪.৩ আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে সার্থক কিনা

১৪.৪ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১৪.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১৪.১ নামকরণ

সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামকরণের একটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কারণ নামকরণের মধ্যে দিয়ে নির্দিষ্ট বিষয়টি সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারণা পাঠকের জন্মায় এবং লেখক এর অভিপ্রায় টি সম্পর্কেও একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। উপন্যাসিক কে তাঁর রচনার নামকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু সচেতনতা অবলম্বন করতে হয় এবং একটি রচনার নামকরণের সার্থকতা এবং ব্যর্থতার উপর রচনাটির সার্থকতা ব্যর্থতা অনেকটা নির্ভরশীল।

কোন উপন্যাস নাটক গল্প বা কবিতার ক্ষেত্রে নামকরণ থেকে রচনাটির বিষয়বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে পাঠক মহল একটা আভাস পেয়ে থাকে। সাধারণত আমরা বিষয়টির ঘটনা চরিত্র বিষয়বস্তুর সঙ্গে নামকরণের সংগতি সাধন করে থাকি। নামকরণের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে রচনা কারও এই বিষয় গুলোর উপরে বিশেষ দিকপাত করে থাকেন। নামকরণ যে যে দিককে কেন্দ্র করে হতে পারে সেগুলো হলো-

প্রথমত, ঘটনা বা বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক। দ্বিতীয়তঃ চরিত্র কেন্দ্রিক। তৃতীয়তঃ পরিবেশ পরিস্থিতি ও পটভূমি কেন্দ্রিক। চতুর্থত ব্যঞ্জনা ধর্মী বা প্রতীক ধর্মী বা সাংকেতিক। আলোচনার মাধ্যমে দেখে নেওয়া যেতে পারে উপন্যাসটির কোন দিকটিকে কেন্দ্র করে লেখক নামকরণ করেছেন এবং তা আদৌ সার্থক হয়েছে কিনা।সমগ্র উপন্যাস জুড়ে আছে 'আরোগ্য নিকেতন' এরই গল্প।তাকে কেন্দ্র করেই বহু চরিত্র,বহু ঘটনা যুক্ত হয়েছে।যুক্ত হয়েছে তাদের সুখ-দুঃখ ভালো-মন্দ জীবন মৃত্যু এবং উত্থান পতনের কাহিনী। প্রকৃতিদত্ত মানুষের অনিবার্য এবং দুর্নিবার সঙ্গী রোগ আর তার থেকে মুক্তি খোঁজার আরোগ্যের সংগ্রাম কবিরাজি হোমিওপ্যাথি এলোপ্যাথি আধ্যাত্ম দর্শন যাই হোক না কেন 'আরোগ্য নিকেতন'কে ঘিরে আবর্তিত বিবর্তিত হয়েছে সমস্ত মানুষের জীবনের বিশেষ অংশ। অসুখ আরোগ্য মৃত্যু এই তিন প্রক্রিয়ায় মানুষের কাহিনী। রোগ এবং আরোগ্য যার মূল কথা। সেক্ষেত্রে আরোগ্য নিকেতন দিয়ে উপন্যাসের সূচনা এবং পরিণতিও সেই কবিরাজের মৃত্যুতে। যার পর আরোগ্য নিকেতন এর চিকিৎসার আর কোন উত্তরাধিকার নেই। এমনকি এই ইঙ্গিতও স্পষ্ট যে আরোগ্য নিকেতন এর চিকিৎসা পদ্ধতির দিনকাল গিয়েছে, কিন্তু একথাও তারাশঙ্কর জানেন যে আরোগ্য নিকেতন এর স্থান হাসপাতাল নিলেও আরোগ্য নিকেতন এর কবিরাজ এর প্রয়োজনীয়তা থেকে যায়। মূলত নতুন চিকিৎসা বিজ্ঞান যেখানে স্তব্ধ সেখানে আধুনিক প্রাচীন প্রাচীন এর শরণাপন্ন হতে হয়। টাইফয়েড চিহ্নিতকরণে যেহেতু সময় লাগে অথচ তার ওষুধ প্রয়োগের প্রয়োজনও হয়ে পরে সেখানে কবিরাজ নাড়ি দেখে বলতে পারেন এ জ্বর সান্নিপাতিক বা টাইফয়েড।সুতরাং হাসপাতালের পাশে আরোগ্য নিকেতন-ও সমান প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

উপন্যাসের শুরু আরোগ্য নিকেতন এর জন্ম ইতিহাস দিয়ে।সেই অতীতকালের সামান্য ভূমিকাটুকু করে ‘আরোগ্য নিকেতন’ নামকরণ কারী চিকিৎসক এর কাহিনী শুরু করেন। সূচনা অংশ বাদ দিয়ে পরের অধ্যায় শুরু হয় যার নায়ক তখন সক্রিয় এবং গল্প শুরু হয় তার চিকিৎসা বিশেষ করে নাড়ি দেখে নিদান দেওয়ার মূল অবলম্বন নিয়ে। যা নিয়ে পরে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে রোগ প্রতিকার এ বিষয়ে নতুন কাল এসেছে।

তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে । কখন তিনি অভিভূত হয়েছেন কখনো আঘাত পেয়েছেন আবার কখনো নির্লিপ্ত উদাসীন থেকেছেন।

উনিশ শো পঞ্চাশ সাল--বাংলা তের শো ছাপ্পান্ন সালের এক শ্রাবণ অপরাহ্নে জীবন মশাই এমনি করেই তাকিয়েছিলেন আকাশের দিকে। পথের উপর থেকে কেউ যেন তাকে ডাকছে।

---- প্রণাম গো ডাক্তার জ্যাঠা।

---- কে? মতি কোথায় যাবি রে?

মতি আসলে এসেছে জীবন মশাই কে নিয়ে যেতে। মায়ের পড়ে যাওয়া বেদনার এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করিয়ে এক্সরে ইত্যাদি ঝামেলা না পোহানোর জন্য সে জীবন মশায়ের শরণাপন্ন হয়েছে। জীবন মশায় নাড়ি দেখে নিদান দিয়েছেন। বলেছেন গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করতে। এই নিদান ঢাকা নিয়ে শুরু হয়েছে মূল দ্বন্দ্ব নবাগত আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতীক পদ্ধতির সঙ্গে। যার মতে এই নিদান দেওয়ার বিষয়টা অমানবিক। তারপর সমগ্র উপন্যাস জুড়ে রোগ আর রোগী। কাহিনী এগিয়ে গেছে চিকিৎসা দ্বন্দ্ব ওষুধ বিজ্ঞান রোগ নানা প্যাথির প্রয়োগ মৃত্যু কঠিন ব্যধি এই সমস্ত বিষয়কে অবলম্বন করেই। কখনো জিতেছে মানুষ কখনো জিতে গেছে দুরারোগ্য ব্যাধি।

তবে শুধু এটুকুতেই উপন্যাসের কাজ শেষ হয়ে যায় না। কোন বড় সার্থক শিল্পের লক্ষ্য শুধুমাত্র কাহিনী নির্মাণ নয় তার সঙ্গে যুক্ত করা ইতিহাসের যুগ ও চেতনা এবং কাল চেতনা। তারাশঙ্করের এই উপন্যাসে যা ভরপুর ভাবে রয়েছে। প্রাচীন আরোগ্য নিকেতন তার প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছে গড়ে উঠছে নতুন আরোগ্য নিকেতন এই বিষয়টিও স্পষ্ট করেছেন তাঁর আলোচনায়। তাই আরোগ্য নিকেতন নামে যার উত্থান তার মধ্যে করণীয় চিকিৎসা অবহেলিত হলে হলেও নবীনের কাছে তার পরাজয় ঘটলেও উপন্যাসের শেষের আগে আবার তার উত্থানের কাহিনী শুনিয়েছেন লেখক। অনেক নতুন ডাক্তার নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি জীবাণু আবিষ্কারক কে হারানোর নতুন ওষুধ

মৃত্যুকে জয় করার সাধনা এও আরোগ্য নিকেতন এর আর এক। কাল সচেতন তারাশঙ্কর ইঁদুরের নিখুঁত বর্ণনা দিতে ভোলেননি। উপন্যাসের সূচনায় তা স্পষ্ট হয়েছে-

---

"আরোগ্য নিকেতন অর্থাৎ চিকিৎসালয়। হাসপাতাল নয় দাতব্য চিকিৎসালয় দেবীপুর গ্রামের তিনপুরুষ চিকিৎসা ব্যবসায়ী মশায়দের চিকিৎসালয়। স্থাপিত হয়েছিল প্রায় আশি বৎসর পূর্বে। এখন ভাঙ্গা অবস্থা মাটির দেওয়াল ফেটেছে চালার কাঠামোটার কয়েকটা জায়গাতেই জোড় ছেড়েছে... কোনরকমে এখনো রয়েছে প্রতীক্ষা করছে তার সমাপ্তির,কখন যে ভেঙ্গে পড়বে সেই ক্ষণটির পথ চেয়ে রয়েছে"।

অথচ যেদিন স্থাপিত হয়েছিল সেদিন আজকের কবিরাজের পিতা জগবন্ধু কবিরাজ বন্ধু ঠাকুরদাস মশায় কে বলেছিলেন আসৃষ্টি না হোক যতকাল তাদের বংশের বসতি থাকবে ততদিন এই ও রইল। থাকবে সদর্পে। কিন্তু তা সত্য হয়নি। তারই সমাপ্তি অংশের কাহিনী এই উপন্যাস।কেননা তারই পাশে গড়ে উঠেছে আর এক আরোগ্য নিকেতন নবযুগের, নবচেতনার।

উপন্যাসে উপযুক্ত আবহ ও বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করতে একটি যথাযথ প্রতিবেশ রচনা করতে অসুখের নাম ওষুধের নামের একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।উপন্যাসে সে ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে সফল হয়েছেন লেখক। তিনি খুব হালকাভাবে নেননি।কাহিনী ও সংলাপ রচনা প্রয়োজনীয় উপন্যাসে রয়েছে।সেজন্যই উপন্যাসের ভূমিকা খুব মজবুত।অন্যদিকে কেবলমাত্র চিকিৎসা বিবরণ দিয়ে যাওয়া উপন্যাসের কাজ নয়। আমাদের আলোচ্য উপন্যাসে এই জীবনসংলগ্নতার পরিচয় মেলে।তবু উপন্যাস জুড়ে ছড়িয়ে আছে সমস্ত অসুখ। যে অসুখ জীবনহানি ঘটিয়ে কখনো জীবন তছনছ করে দিয়েছে।উপন্যাসে উপযুক্ত আবহ ও বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করতে একটি যথাযথ প্রতিবেশ রচনা করতে অসুখের নাম ওষুধের নামের একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।উপন্যাসে সে ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে সফল হয়েছেন লেখক। তিনি খুব হালকাভাবে নেননি।কাহিনী ও সংলাপ রচনা প্রয়োজনীয় উপন্যাসে রয়েছে।সেজন্যই

উপন্যাসের ভূমিকা খুব মজবুত।অন্যদিকে কেবলমাত্র চিকিৎসা বিবরণ দিয়ে যাওয়া উপন্যাসের কাজ নয়। আমাদের আলোচ্য উপন্যাসে এই জীবনসংলগ্নতার পরিচয় মেলে।তবু উপন্যাস জুড়ে ছড়িয়ে আছে সমস্ত অসুখ। যে অসুখ জীবনহানি ঘটিয়ে কখনো জীবন তছনছ করে দিয়েছে। আমার আছে সাধারণ অসুখ আছে এমন সমস্ত আঞ্চলিক অদৃশ্য রোগ বিজ্ঞান এখনো যার অনুসন্ধান ও শনাক্তকরণের অবকাশ বা যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি।

দাঁতু ঘোষালের হয়েছে বদহজম থেকে হাঁপানি । আর রয়েছে গাঁজা। বিপিনের রক্তচাপ মূত্রাশয়ের দোষ হিক্কা। গর্ভ সুতিকা। মঞ্জরীর মিথ্যা অসুখ-বিসুচিকা পেটে কৃমি হওয়া সেই রোগী রঙ্গলাল ডাক্তার যাকে টাকা নেই বলে চিকিৎসা করতে চাননি। কিশোরের একজ্বরী আগন্তুক জ্বর সান্নিপাতিক দোষযুক্ত সর্দির দোষ,বাতরোগের সঙ্গে অজীর্ণ রোগে জীর্ণ দেহে পড়ে যাওয়া সেই রোগিণী যা ধনুষ্টংকারের মতো। কিন্তু তা নয়। মহন্তের রক্ত ভেদ। গণেশ ভট্টাচার্যের কন্যার প্রসব বেদনা । মিত্র মশাইয়ের মদ্যপানের ফলে লিভারে বেদনা মাথায় গোলমাল। এছাড়া আমাশা জ্বর ম্যালেরিয়া রেমিটেন্স টাইফয়েড অল্প জ্বর মাথা যন্ত্রণা নিউমোনিয়া জন্ডিস মশা ম্যালেরিয়া বহনকারী কলেরার জীবাণু মেনিনজাইটিস ত্রিদোষ যুক্ত নাড়ি। এইসব রোগই এসেছে মানুষের কাছে মৃত্যুদূত হয়ে। একইসঙ্গে এসেছে তার চিকিৎসা এবং ওষুধের বর্ণনা। আগুনের শেখ পেনিসিলিন স্ট্রেপটোমাইসিন এক্সরে রক্ত পুঁজ মলমূত্র পরীক্ষা প্রভৃতি।

তবে কি সমগ্র আরোগ্য নিকেতন জুড়ে রোগব্যাধি মৃত্যুর কথাই আছে। তাই কি জয়ী হয়েছে এখানে। আসলে তা নয়। পুরাতন আরোগ্য নিকেতন এর ভগ্নদশা অনেক ব্যাধি অনেক মৃত্যুর পরও মানুষের অক্লান্ত জীবন যুদ্ধ মৃত্যুকে জয় করার প্রয়াসই দেখিয়েছেন লেখক।

পুরাতন আরোগ্য নিকেতন ভেঙে তার সারটুকু নিয়ে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে গড়ে উঠেছে নতুন আরোগ্য নিকেতন।নিয়ে রোগ ব্যাধি যত রূপ নিয়ে আসুক তার বিরুদ্ধে মানুষ লড়াই চালিয়েছে। নিত্যনতুন আবিস্কারে তাকে প্রতিহত করেছে।মৃত্যু

অনিবার্য।তাকে রোধ করা যাবে না ।কিন্তু অকাল মৃত্যুকে জয় করার সাধনা করে চলেছে অনবরত। ভেঙে যাওয়া নিঃশেষিত হওয়া প্রাচীন আরোগ্য নিকেতন ও তার চিকিৎসক নতুন যুগান্তকারী সাধনা মানুষের সাহস শক্তি নতুন ডাক্তারের শ্রম কে সম্মান জানিয়েছেন। হাসপাতাল রোগের কারণ ওষুধ প্রতিরোধী জীবাণু আর প্রদ্যোত ডাক্তারের কর্ম প্রয়াসকে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তিনি।জীবন জয়ের এই নতুন সাধনার কাছে তিনি মাথানত করেছেন। আর প্রদ্যোত ডাক্তার নতুন কাল নতুন জীবনের প্রতীক তিনি ভেবেছেন-

"নতুন কাল।বিজ্ঞানের যুগ। অদৃষ্ট নিয়তি নির্বাসনের যুগ।ব্যধিকে জয় করবে মানুষ। মৃত্যুর সঙ্গে সে যুদ্ধ করবে। মৃত্যুর মধ্যে অমৃত খুঁজেছে মানুষ অসহায় হয়ে। এবার জীবনের মধ্যে অমৃত সন্ধানের কাল এসেছে।একালে অনেক আয়োজন চাই ।অনেক কিছুর আয়োজন"।

"সুন্দর হচ্ছে বাড়িখানা। ডিসেন্ট বিল্ডিং। চারিদিকে চারটে উইং থাকলে আরো সুন্দর হতো। হবে স্কীম আছে। পরে হবে।"

এই গভীর আশাবাদ-ই আরোগ্য নিকেতন এর মূল কথা।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য উপন্যাসটি শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে 'সঞ্জীবন ফার্মাসী' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। হয়তো জীবনের দ্যোতনা এই নামে বেশি ছিল।কিন্তু আরোগ্য নিকেতন এর নামের মধ্যেও দ্যোতনা না কিছু কম নেই। জীবন মশায়ের ছেলে বনবিহারীর চিকিৎসালয়ের নাম ছিল 'সঞ্জীবন ফার্মাসি' তার আয়ুষ্কাল যৎসামান্য। কিন্তু আরোগ্য নিকেতন এর ভাঙা-গড়ার কাহিনী এবং তাকে কেন্দ্র করে রোগ আরোগ্য জীবন-মৃত্যুর চিরন্তন প্রক্রিয়া জীবন সমাজ ইতিহাস এর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। তাই নামকরণ সম্পূর্ণভাবেই প্রাসঙ্গিক ও সার্থক।

১৪.২ উপন্যাসের মৃত্যুচেতনা

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং

শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্"।।

মৃত্যু মানুষের জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। তার অনিবার্য তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনাদি-অনন্ত রহস্যময়তা। তা নিশ্চিত জেনে মানুষ তার জীবনকে তৈরি করেছে। তার জীবনযাত্রার ভোক্তা অধিকার সব এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সুনিশ্চিত মৃত্যুর ছক। সেই মৃত্যুকে মানুষ আদি অনন্তকাল কাল থেকে জানতে চেয়েছে বুঝতে চেয়েছে তাকে জয় করার কথা ভেবেছে। জীর্ণ শরীর ত্যাগ কে মেনে নিয়েছে মানুষ। কিন্তু তার সাথে মিশিয়েছে আত্মার অবিনশ্বরতা তত্ত্ব। তৈরি করেছে জন্মান্তরবাদ স্বর্গ মর্ত পাতাল এর ধারণা। প্রিয়জন বিয়োগের বেদনা কে দিয়েছে দার্শনিকতার ছোঁয়া। বেদ পুরাণ রামায়ণ মহাভারত থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ পর্যন্ত এই মৃত্যুচিন্তা প্রসারিত হয়েছে নব নব জ্ঞান ও ব্যাখ্যায়। গীতার তত্ত্ব থেকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মৃত্যুকে চিনিয়েছে নব নব রূপে ভাবিয়েছে তাকে। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে অকালমৃত্যুর বিয়োগ বেদনা। প্রিয় জন বিরহিত মানুষ একদিন অসহায় ভাবে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। সান্তনা চেয়েছে অদৃষ্টের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে ঈশ্বরের কাছে। আবার কখনো মৃত্যু কাম্য হয়েছে। অসহ জীবন তাকে মৃত্যুর মধ্যে মুক্তি দিয়েছে। সেখানে তার কাম্য শান্তি চরিতার্থ হয়েছে কিনা তা জানা যায়নি। মৃত্যু কি কেমন তাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে মানুষ বারবার নানাভাবে। কিন্তু তাকে বোঝা যায়নি। বুঝতে পারেননি আমাদের আলোচ্য উপন্যাসের নায়ক জীবন মশায়। সমগ্র জীবন যিনি মৃত্যুকে দেখেছেন রোগীর নাড়ীতে যার পদধ্বনি শুনেছেন অন্যের বেলায় রোগীর বেলায় আমৃত্যু অপেক্ষা করেও তাকে বুঝতে পারিনি জীবন মশায়। শেষ মুহূর্তে তার প্রতীক্ষা অনন্ত শূন্যতায় মিশে গেছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে----

"তাঁহার নিজের মরণ তাঁহার জীবনব্যাপী মৃত্যু রহস্য ভেদ প্রয়াসের অন্তিম পর্ব। মৃত্যুকে রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শ শব্দের বিষয়ে রূপে অনুভব সাধনার যজ্ঞে পূর্ণাহুতি"।

"উপন্যাসের প্রকৃত নায়িকা পিঙ্গলকেশীনি অলক্ষ্যসঞ্চারিণী রহস্যাবগুণ্ঠিতস্বরূপা মৃত্যু দেবী। সমস্ত উপন্যাসের তাহারই কালো ছায়া পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। বিচিত্র অবস্থাভেদে

মধ্যে তাহার আবির্ভাবের আভাস উপন্যাসের ভাব বৈচিত্রের মূল উৎস। তাহারি অলক্ষ্য সত্তা না না আভাসে ইঙ্গিতে জীবন বীণায় নানা রাগিনী বাজাইয়া মানব মনের গভীরে নানা আবর্ত চক্র জাগাইয়া তাহার ভাষায়ও আচরণে নানা বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার রেখাজাল অংকন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়া ফিরিয়াছে"।(শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

একথা সত্য মৃত্যু এখানে নায়িকা। সারা উপন্যাসেই প্রধানা শক্তি। ঐতিহ্যে আত্ম সাধনা এবং আয়ুর্বেদের গভীর অনুভূতি কে লেখক যেন বিশ শতকে এসে নতুন করে ব্যাখ্যা করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞান যখন মৃত্যুকে জয় করবার রোধ করবার কঠিন সাধনায় ব্যস্ত তখন প্রাচীন সেই চিকিৎসাশাস্ত্র মৃত্যু সম্পর্কে ভারতীয় সনাতন ধারণাকে পাশাপাশি রেখে জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বকে দেখিয়েছেন। সমগ্র উপন্যাস জুড়ে এই প্রতিরোধ অথবা সাধনা অসহায় সম্মতি আর তীব্র অসম্মতির দুই চিকিৎসাশাস্ত্রের সঙ্গে যুদ্ধে সঙ্গে যুদ্ধে আহ্বান করে মৃত্যুর পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। কখনো সে জিতেছে কখনো সেই অমোঘ শক্তির কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করেছে।

লেখকের মৃত্যুর প্রধান এই উপন্যাসে মৃত্যুর যাবতীয় রূপকে আনার চেষ্টা করেছেন। ব্যাধি অকাল মৃত্যু পরিণত মৃত্যু মৃত্যু সম্পর্কে উদাসীনতা স্থিরচিত্রে গ্রহণ বাঁচার তীব্র আকুতি নানা চরিত্রে নানা পরিবেশে নানা প্রতিবেশে তার বিচিত্র প্রতিক্রিয়া মৃত্যু সম্পর্কে গভীর অনুভূতি স্বয়ং জীবন মশাই এর মধ্য দিয়ে লেখক এর অনুভূতি মৃত্যুর পদচারী স্পৃষ্ট সমস্ত ঘটনা ও কাহিনী উপন্যাসে মৃত্যুর দ্যোতনাই প্রকাশ করেছে বারবার। ঘটনা ও ভাবনায় চিন্তনীয় মননে কথকের কথকতায়, চরিত্রের উপলব্ধিতে ব্যক্তির ব্যাধি থেকে মৃত্যুতে রুপান্তরে। নানা প্রতিবেশে নানা পরিবেশে নানা চরিত্রে বিচিত্রভাবে এসেছে মৃত্যুর প্রসঙ্গ। এককথায় সমগ্র উপন্যাস জুড়ে রয়েছে মৃত্যুর প্রতিচ্ছবি। বাংলা সাহিত্যে এমন উপন্যাস আর দ্বিতীয়টি নেই।

প্রথমেই মৃত্যুর জন্ম কথা বলেছেন লেখক। বর্ণনা দিয়েছেন তার চেহারার। ব্রহ্মার অঙ্গ থেকে ছায়ামূর্তি নারী রূপ গ্রহণ করল। "পিঙ্গলকেশা,পিঙ্গলনেত্রা, পিঙ্গলবর্ণা,গলদেশে ও মনিবন্ধে পদ্মবীজের ভূষণ, অঙ্গে-গৈরিক কাষায়", তিনি এই নিষ্ঠুর কর্ম করতে রাজী

হলেননা এ যে পাপ। ভগবান বললেন মৃত্যু পাপ-পুণ্যের ঊর্ধ্বে। কর্মফল আনবে মৃত্যু আনবে রোগের মাধ্যমে। অনাচার ব্যাভিচার এর ফলে রোগগ্রস্ত হবে মানুষ। মৃত্যু তাদের দেবে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি জ্বালা থেকে শান্তি জন্ম থেকে জন্মান্তর। কোন ক্রন্দন কোন আর্তবিলাপ যায়না তার কানে। সে বধির।

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা সম্পর্কে চমৎকার ব্যাখ্যা আছে জগৎমশায় জীবনমশায়কে বলেছ-

"বাবা যে চিকিৎসক নাড়ি বিজ্ঞানী সিদ্ধিলাভ করতে পারে তার সঙ্গে মৃত্যুকে সন্ধি করতে হয়। মৃত্যুর যেখানে অধিকার সেখানে মৃত্যু বলে আমার পথ ছেড়ে দাও। এ আমার অধিকার। আর যেখানে তার অধিকার নাই সেখানে ভুলক্রমেও উঁকি মারলে চিকিৎসক বলেন---দেবী, এখনো সময় হয় নাই এক্ষেত্রে তোমাকে সস্থানে ফিরতে হবে"।

"...মৃত্যু যেমন অমোঘ পঞ্চম বেদ আয়ুর্বেদের স্রষ্টা ব্রম্ভার সৃষ্টির ভেষজ এবং ঔষধি শক্তি ও তেমনি অব্যর্থ। যে ব্রম্ভার ভ্রুকুটিকুটিল দৃষ্টি থেকে সৃষ্টি হলো মৃত্যুর সেই ব্রম্ভার ই প্রসন্ন দৃষ্টি থেকে সৃষ্টি হয়েছে ভেষজের"।

সাধারণ মানুষ মৃত্যুর পূর্বে দেখেন স্বজনকে। তারা নাকি নিতে আসেন। মহান্তের কথায় ও বিশ্বাসের প্রতিধ্বনী বেজে উঠেছে-

"মনে নিছে ভাই কি ছুটি মিলবে। কাল রাতে যেন মনে হইলরে ভাই কি উদার থেকে দশ বারোটা খড়ম কে আওয়াজ উঠেছে। আউর মনে হইল রঘুবীরজির আওয়াজ মিলছে। ওহী জঙ্গলের পঞ্চতপার আসন সে হাঁকছে,আও ভাইয়া!আও!"

এরমধ্যে অলৌকিকত্ব কিচ্ছু নেই । শরীর বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সহজেই ব্যাখ্যা করতে পারবে। যেমন ব্যাখ্যা মেলে এই লোক বিশ্বাসের মিথের মায়ার কলেরা রুপী মৃত্যুকে দেখতে পাওয়ার ভয়ানক বর্ণনায়

"কলেরা কে নাকি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সন্ধ্যার মুখে তাকে দেখা যায়। শীর্ণ কঙ্কালসার শরীর চোখে আগুনের মতো দৃষ্টি পিঙ্গল রুক্ষ চুল দন্তুর একটি মেয়ে পরনে তার একখানা ক্লেদাক্ত জীর্ণ কাপড় বগলে একটা মড়াবাওয়া তালপাতার চাটাই নিয়ে সেই পথ ধরে গ্রামে ঢুকে যে পথ ধরে গ্রামের শব নিয়ে শ্মশানে যায়। সন্ধ্যায় ঢুকে যার সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয় সেই হতভাগ্যই সেই রাত্রে কলেরায় আক্রান্ত হয়। মরে। তারপর রোগ ছড়ায় ঘরে ঘরে পাড়ায় পাড়ায়"।

চরম বাস্তব বাদী রঙ্গলাল ডাক্তারের কাছে আস্তিক জীবন মশায় কলেরা দিনে সে ভয়ঙ্কর মৃত্যুর বর্ণনা দিয়েছেন। মানুষ যেখানে অসহায় চিকিৎসাবিজ্ঞান যেখানে ব্যর্থ সেখানে মারি মন্বন্তরে মানুষের মধ্যেই সাক্ষাৎ মৃত্যুকে উপলব্ধি করে। গণ মৃত্যু অপঘাতে মৃত্যু সেখানে ভয়ানক হয়ে ওঠে।তাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা মানুষের নেই।

জীবন মশায়ের মত চিকিৎসকের চোখেও তাই মৃত্যু একদিন এইভাবে ধরা দিয়েছিল-

"মরণ টেনে নিয়ে চলেছে জীবনকে। একেবারে এলোকেশী এক ভয়ঙ্করী। হাত বাড়িয়ে ছুটেছে গ্রাস করবে অনন্ত ক্ষুধা। আর পৃথিবীর জীবকুল ভয় পাগলের মত ছুটছে।ছুটতে ছুটতে এলিয়ে পড়ছে,মৃত্যু তাকে গ্রাস করছে। অহরহই ওই তাড়ায় তেড়ে নিয়ে যাচ্ছে মৃত্যু! এখানে ভগবানের নাম করে তাকে ডেকে ভরসা সঞ্চয় ছাড়া কি করবে মানুষ?"

মৃত্যুর আগে কখনো লালসা। তাই হয়ে ওঠে রিপু। ওর তাড়নাই ছুটতে গিয়ে মুখ থুবরে পড়ে মানুষ। সামনে এসে দাঁড়ায় সেই পিঙ্গলকেশিনী। বিপিনের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধি প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা তারিখ হয় তাকে ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর। তার পিতা রতন বাবু কিন্তু মৃত্যুকে নিয়েছেন সহজ। পন্ডিত জ্ঞানীদের এই মানুষটি পুত্রের অসুস্থতার পর ডাক্তারি বইয়া নিয়ে এই রোগ সম্পর্কে পড়াশোনা করে সব বুঝেছেন। পৃথিবীতে মানুষের জীবনের ক্ষণস্থায়ীত্ব মর্মান্তিক তত্ত্বও তিনি ভাল করেই জানেন।

মৃত্যুর বিবিধ রূপ। মানুষের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ মৃত্যুর কে গ্রহণ করার বিষয়ে জীবন্ত মানুষের ভাবনা যন্ত্রণা আর্তনাদ এবং নিরাসক্তি ব্যক্তিমানুষের এই অনুভূতি মৃত্যুর সুন্দর অথবা নিষ্ঠুরতাকে কতভাবে দেখিয়েছেন লেখক। মৃত্যু সম্পর্কে মহান্তের সুন্দর গ্রহণ করার ইচ্ছা নিজের পরিণতি জেনে যাওয়া সেকালের প্রবীণ মানুষের এক আশ্চর্য অবস্থাকে প্রতিফলিত করেছে। দাস্ত তাঁর ব্যাধি, প্রাচীন শরীরটাকে সামলাতে পারেনি। যদিও নিষ্ঠুর যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে মুখ বিকৃত করেছেন তিনি। চোখের পাতায় নেমে এসেছে গভীর আচ্ছন্নতার ভাব। শেষ চিকিৎসা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন তিনি। বারবার অনুরোধ করেছেন তার যেন কোন চিকিৎসা করা না হয়। জীবন মশায়ের কথামত তার ছুটি চাই। মানুষের কাছে মৃত্যু কখনো এমন কাঙ্খিত ও স্বাভাবিক গ্রুপেও ধরা দেয়। লেখক কখনো প্রতীকে মৃত্যুর প্রাকৃতিক উল্লেখ করেছেন-

"অন্ধকার রাস্তায় বাড়ি কাঁকড়ের উপর মশাইয়ের পায়ের জুতোর শব্দ উঠছে"। "এই জায়গাটা নির্জন বসতহীন। অনেকটা পিছনে নবগ্রামের বাজার পটির আলোর ছটা শূন্যলোকে ভাসছে। এতটা দূরে বাজারের কোলাহল স্তিমিত হয়ে এসেছে,ক্ষীণ হয়ে আসছে ক্রমশ। বর্ষার মাঠে ব্যাঙের ডাকের ঐক্যতান উঠছে। কলরব করছে। ওটা কি যন্ত্রণাকাতর শব্দ!ওঃ,সাপে ব্যাঙ ধরেছে।মশায় থমকে দাঁড়ালেন।আবার চললেন"। একান্ত নির্জনতায়ও মৃত্যু জীবন মশায়কে ছেড়ে সে যায়নি।

শশাঙ্কের মৃত্যু এই উপন্যাসের মৃত্যু ভাবনা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে শশাঙ্কের মৃত্যু উপস্থিত বুঝতে পেরে তার স্ত্রী অভয়া কে জীবন মশায় ভোগ খাওয়াতে চেয়েছেন। লাল পাড় শাড়ি পরা এই গৌরতনু বধূটির যে অপরূপ রূপ দেখেছেন তাতে তার মনে হয়েছে এই বধু রূপেই তার সকল রূপের চরম প্রকাশ। কিন্তু বধূটির এই অপরূপ রূপ মুছে দিয়ে শশাঙ্ককে চলে যেতে হবে। এটা জানার পর অভয়াকে নিমন্ত্রণ করেছেন তিনি। দিয়েছেন মাছের মুড়ো। খেতে বসে এসব দেখে আঁতকে উঠে অভয়া। খাবার ছেড়ে উঠে গেছে সে। তারপর একসময় প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছে নিজের ছেলে হলে কি জীবন মশাই এমনটা করতে পারতেন। হয়তো সেই অভিশাপেই জীবন মশায়ের ছেলে বনবিহারী কে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে হয়েছে।

বনবিহারী কাছে মৃত্যু এসেছিল ব্যাধির রূপ নিয়ে অকালে। বনবিহারী রোগ প্রকাশিত হলে ভূপীর কুৎসিত রোগে হাসার কথা মনে পড়ে গেছিল জীবন মশায়ের। হয়তো এ তারই অভিশাপ। নিজে ডাক্তার হয়েও বনবিহারী মৃত্যুকে নিমন্ত্রণ করেছিল। এই উপন্যাসে মৃত্যুর সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে জীবন মশায়ের দর্শন ভাবনা সর্বত্র ব্যাধিকেই মৃত্যুর অনিবার্য সত্য রূপে হাজির করা হয়েছে। যা কখনো ব্যভিচার অমিতাচার হিসেবে দেখানো হয়েছে।

ভূপীর ক্ষেত্রে যা ঘটেছে বনবিহারী ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। বিলাসব্যসন ব্যভিচার তাদের অকাল মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু সেই ডেকে আনা মৃত্যুকে ফেরাতে পারিনি বনবিহারী। বরং তা স্পর্শে আগ্রাসে সে ভীত হয়েছে। বাঁচার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। চিৎকার করেছে "আমাকে বাঁচাও। আমাকে বাঁচাতে পারলে না তোমরা।আমি বাঁচবো"। অথচ এই জীবনকে সে অবহেলায় ক্ষয় করেছে। অকালে চলে গেছে পুত্র। হে মৃত্যুও উপন্যাস একটি জটিলতার সৃষ্টি করেছে।

বলাবাহুল্য আরোগ্য নিকেতন মৃত্যুময় উপন্যাস। তারাশঙ্কর মৃত্যুর কথা বলেছেন বটে তার অনিবার্য ভয়ঙ্কর উপস্থিতির কথা বলেছেন কিন্তু তবুও ভুললে চলবে না এই উপন্যাসের নাম আরোগ্য নিকেতন। প্রাচীন কবিরাজের আধ্যাত্ম দার্শনিকভাব না হোক বা যুবক ডাক্তারের বিজ্ঞান ভাবনা। সবার লক্ষ্য এক উদ্দেশ্য এক। মৃত্যুকে জয় করা। কিন্তু আসলে মৃত্যুকে জয় করা যায় না। কারণ মৃত্যু অনিবার্য। তারাশঙ্কর ও সেই কথা অস্বীকার করেননি। তিনি জীবন সাধনার কথাই বলেছেন। চেয়েছেন মৃত্যু যেন স্বাভাবিক হয়। জীবনের পূর্ণ আস্বাদনের শেষে তার সাদর আমন্ত্রণ। কিন্তু মানুষের সাধনা একটাই সে জয় করবে অকালমৃত্যু কে ব্যাধিকে। আকস্মিক মৃত্যু কে। সবাই অপেক্ষা করছে জেনে মঞ্জরী তাই মৃত্যু কামনা করেন মহান্ত দেহত্যাগ করেন। মতির ছেলের মৃত্যুতে তার মায়ের মনে হয় এই মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল। আর জীবন জয়ের কথা ব্যক্ত হয় মহাশয় এর নিদান হাঁকে ব্যর্থ করে মতির মায়ের আরোগ্য । মঞ্জুর সুস্থ হয়ে ওঠা।

আরোগ্য নিকেতন তাই মৃত্যুচেতনা উপন্যাস হয়েছে যেমন সত্য তেমনি মানব সভ্যতার মৃত্যুঞ্জয়ী ভাবনা ও কর্মকে সে সম্মান জানিয়েছে। জীবনের অবিনশ্বরতা কে ধারাবাহিকতাকে স্বীকার করেছে।

১৪.৩ আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে সার্থকতা লাভ করেছে কি?

সমালোচকদের মতে ত্রিশের যুগের বাংলা উপন্যাস সাবালকের দ্বিধা মুক্তি অর্জন করেছে এই তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারণেই। "তিনজনের মধ্যে একই সঙ্গে কাজ করেছে একটা বোধ যার মূল কথা হল সংকট। তারাশংকর দেখিয়েছেন একটা শ্রেণি সংকট। বিভূতিভূষণ দেখিয়েছেন একটা অনুভুতির সংকট। মানিক দেখিয়েছেন ব্যক্তির সংকট অথবা জটিলতা। তারাশঙ্করের ইতিহাসবোধ,

বিভূতিভূষণের প্রকৃতি ও মানিকের সমাজবোধ এই জটিলতার ওপর আলো ফেলেছে।"

এদের মধ্যে তারাশঙ্কর জীবনের ব্যাপক অভিজ্ঞতায়,অজস্র বিচিত্র- সরল_জটিল-প্রতিষ্ঠিত- অবহেলিত মানুষের চরিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর উপন্যাসে। তার প্রায় সব উপন্যাসের পটভূমি তাঁর নিজের অঞ্চল রাঢ়। এখানকার মানুষদের তিনি খুব কাছ থেকে চিনতেন এবং জানতেন।সেইসব মানুষগুলোর দিনযাপন, জীবন চারণ,তাদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য,তাদের সংকট,তাদের শ্রেণী-সংগ্রাম সমস্তকিছুই তারাশঙ্করের নখদর্পণে ছিল। আর তাঁর রচনার ক্ষেত্রে তিনি সেগুলোকেই সাহিত্যের মোড়কে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো যুব পরিবর্তনের একটি সময়ের সন্ধিক্ষণে। পুরাতন এবং নবীনের দ্বন্দ্ব বারবার তার লেখায় দেখা যায়। যা সেইভাবে আর অন্য কোন উপন্যাসিকদের রচনার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় না। একদিকে অস্তগামী জমিদার বংশ জমিদারি সম্প্রদায় আবার অন্যদিকে রয়েছে কাহার থেকে ডোম,বৈষ্ণব থেকে শাক্ত, কৃষক থেকে বেদে, সাঁওতাল থেকে ঝুমুর গানেরদল---- বিচিত্র মানুষ বিচিত্র তাদের পেশা। তৎকালীন সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসোন্মুখ ও নবীন বুর্জোয়া সভ্যতার উত্থান

এই দুইয়ের সন্ধিক্ষণকে এবং সেই দ্বন্দ্বকে তারাশঙ্কর নিজস্ব ইতিহাস চেতনার দ্বারা অত্যন্ত দক্ষতায় উপন্যাসে দেখিয়েছেন।সমগ্র রাঢ় জনজাতি একটা সম্পূর্ণ সামগ্রিক চিত্র তিনি তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। আসলে তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতা ছিল ব্যাপক মানব সমাজ। যা তাঁর লেখায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে ধরা দিয়েছে।সমাজের বিভিন্ন দিক, বিভিন্ন মানুষ এবং বিভিন্ন পেশার মানুষ সব সময় তার গল্পে অগ্রাধিকার পেয়েছে। তবে শুধু যে অঞ্চল, অঞ্চল ভিত্তিক মানুষ অর্থাৎ আঞ্চলিক পটের সীমাবদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন তিনি তা নয়। আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করে তিনি পৌঁছে গেছেন জীবনের চরম সত্যে। দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধের চরম আঘাত সমস্ত পৃথিবী কে সংবেদনশীল সাহিত্য জগতকে ব্যাকুল করেছে। তারাশঙ্করও তার ব্যতিক্রম নন। কিন্তু এই সংকটে তিনি অস্থির হননি। তাঁর জীবন দর্শনে মানুষের জীবনের প্রতি মমতা অবিশ্বাস অবিচল থেকেছে।তারাশঙ্করের সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মন্তব্য করেছেন---

" 'জীবদেহে'র আকুতির সঙ্গে 'জীবনে'র চাহিদার জোড় মেলাতে তারাশঙ্করও প্রথমাবধি সমস্যাবিদ্ধ হয়েছিলেন।অবশ্য জীবন ও জীবদেহাকৃতির সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা স্বতন্ত্র্য;--- রাঢ় প্রত্যন্তবর্তী আপন জন্ম মাটি- বীরভূম-লাভপুরের গ্রাম জীবন নির্ভর। অশিক্ষা, সামাজিক উপেক্ষা,আর্থিক রিক্ততা এবং অন্ধ সংস্কারে জড়ানো সে জীবনে উদাত্ত যে আদিমতা ওতপ্রোত হয়েছিল, শহুরে ব্যবচ্ছিন্নতা লাঞ্চিত জীবনভূমিতে তার অভিজ্ঞতা দূরে থাক,স্বপ্নও ছিল অকল্পনীয়।ভঙ্গুর জমিদারিতন্ত্রের প্রতি অন্তরে শ্রদ্ধানত অন্তিম প্রতিভূ ছিলেন তিনি।সে যেমনই হোক,আসলে নূতন কালের চেতনা তাঁর সত্তায় স্বতন্ত্র মাত্রায় প্রকাশিত।'কল্লোল'-এর সঙ্গে অন্তরের মেলবন্ধন তাঁর ঘটেনি।"

'আমার কালের কথা','আমার সাহিত্য জীবন' প্রভৃতি গ্রন্থে তারাশঙ্করের মানবপ্রীতি,কাল চেতনা ইতিহাসের সন্ধিক্ষণের দ্বন্দ্ব চোখে পড়ে।তাঁর উপন্যাসে একদিকে যেমন বীরভূমের কাকুরে মাটি ও তার রুক্ষ মানুষ উঠে এসেছে, তেমনই

দুর্গাপুর,আসানসোল চিত্তরঞ্জন,কুলটিও স্থান করে নিয়েছে তাঁর লেখায়।এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর আধ্যাত্মবোধ।বৈষ্ণব,বাউল,আদিম যৌন বাসনা,শাশ্বত হিন্দুধর্মকে আত্তীকরণ করে তিনি তাঁর রচনা চালিয়ে গেছেন। চরিত্রগুলোকে নিয়ে গেছেন বিশ্বাসের ধ্রুবলোকে। অন্তর দিয়ে তিনি তাঁর মাটি ও মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন বলেই রাঢ়ের মানুষের সমগ্র তার উপন্যাসে এত গভীরভাবে ধরা পড়েছে। পাশাপাশি আত্মচেতনাকেও তিনি এড়িয়ে যাননি। বস্তুজগতের অতিরিক্ত কিছু আস্তিক্য অজ্ঞাত জগত।যাকে তিনি অস্বীকার করেননি কখনও।

আঞ্চলিক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্করের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তারাশঙ্করের হাতেই বিভিন্ন আঞ্চলিক উপন্যাস যথার্থ রূপ লাভ করেছে।

আঞ্চলিক উপন্যাসের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

প্রথমতঃ বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের পটভূমি।

আঞ্চলিক উপন্যাসের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

প্রথমতঃ বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের পটভূমি।

দ্বিতীয়তঃ বিশেষ জনগোষ্ঠীর সংঘবদ্ধ জীবনচর্চা।

তৃতীয়তঃ অঞ্চলের স্থানিক আয়তনিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য

চতুর্থতঃ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ

পঞ্চমতঃ গ্রামীণ প্রতিবেশী সম্পর্কের নানা বৈশিষ্ট্য

ষষ্ঠতঃ আঞ্চলিক জীবনে বহিরাগত প্রভাবের ফল

সপ্তমতঃ অঞ্চল গত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য।

তবে এ ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে বলা যায় আরোগ্য নিকেতন যথার্থ আঞ্চলিক উপন্যাস নয়।

রাঢ় অঞ্চল কে উপন্যাসে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের ভূমিকা সর্বাধিক।রাঢ়ের মানুষের কথা যেমন তিনি বলেছেন,তেমনি বলেছেন রাঢ়ের লাল রুক্ষ কাঁকুড়ে মাটি, তার আঁকাবাঁকা নদনদী, গাছপালা,কৃষি বাণিজ্যের কথা। সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃতি প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।

আরোগ্য নিকেতন এর ক্ষেত্রেও এরূপ দেখা যায়। এই উপন্যাসের মূল বক্তব্য হলো মৃত্যুচেতনা। মৃত্যুর অনিবার্যতা বা বৈচিত্র এবং তার সঙ্গে ব্যাধি রোগ এবং আরোগ্য প্রয়াস এরই কাহিনী। একই সঙ্গে জুড়ে গেছে কাল চেতনা। চিকিৎসা পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে এসেছে নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্ব। যেখানে কবিরাজি এবং অ্যালোপ্যাথি দ্বন্দ্ব দেখা গেছে। উপন্যাসে দেখা যায় কবিরাজি কেবল গাছপালা জরিবুটি উপর নির্ভরশীল নয় একটি বস্তু অতিরিক্ত আধ্যাত্মিক চেতনার উপর নির্ভরশীল। জীবন-মৃত্যুর অনিবার্য সংঘাত জয় পরাজয়। নাড়ির স্পন্দনে ধ্বনিত হয় মৃত্যুর সংকেত। আর অ্যালোপ্যাথি জানে বস্তুকে জীবাণুকে ধ্বংস করার অতি আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক কৌশল। এখানে তারাশঙ্কর যেমন জীবন মশাইয়ের গল্প বলতে চেয়েছেন। তেমনি প্রদ্যোত ও তার কালকেও অস্বীকার করেননি তিনি। বিজ্ঞানের আবিষ্কার এর কাছে মাথা নত করেছে তাঁর কবিরাজ।

উপন্যাসে গ্রামের নাম দেবীপুর।আয়ুর্বেদিক যুগ অস্তমিত অ্যালোপ্যাথি বিজ্ঞানের নতুন যুগের উদয় এই হল গল্পের প্রেক্ষাপট।এই সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয় এর বর্ণনায় প্রকৃতি অনেকটা যুক্ত হয়েছে। পুরনোর অবক্ষয় ও নতুনের উদ্ভাস সম্পর্কে লেখক বলেছেন- এই আরোগ্য নিকেতন "স্থাপিত হয়েছিল প্রায় আশি বৎসর পূর্বে। এখন ভাঙ্গা ভগ্ন অবস্থা,মাটির দেওয়াল ফেটেছে, চালার কাঠামোটার কয়েকটা জায়গাতেই জোড় ছেড়েছে- মাঝখানটা খাঁজ কেটে বসে গেছে কুঁজো মানুষের পিঠের খাঁজের মতো"।

আবার কালান্তরের বর্ণনায় লেখক লিখছেন-

"যাবেন মহানগরী থেকে শতাধিক মাইল। চলে যাবেন বড় লাইনের ট্রেনে।...জংশনে নেমে পাবেন একটি অপরিসর শাখা-রেলপথ।মাইল দশেক গিয়ে পাবেন একটি সমৃদ্ধ

গ্রামের স্টেশন।চারিদিকে দেখতে পাবেন কালান্তরের সুস্পষ্ট পরিচয়।দেখতে পাবেন, একখানা ট্যাক্সি, একখানা মোটর বাস, সাইকেল রিকশা,গোরুর গাড়ি।...দেখতে পাবেন ভাঙ্গা-গড়ায় বিচিত্র গ্রামখানিতে পুরাতন-নূতনের সমাবেশ"।

এর পাশাপাশি সামন্ততন্ত্র ও বুর্জোয়া অর্থাৎ পুরাতন ও নতুন এর চমকপ্রদ বিবরণ প্রকৃতি প্রতিবেশের বর্ণনায় ফুটে উঠেছে-

"পাকা লাল কাঁকুরে তৈরি সড়ক ধরে যাবেন।দেখবেন প্রাচীনকালের জমিদারদের বড়ো বড়ো নোনা ধারা পাকা বাড়ি।ভাঙ্গা বাগান।ধসে পড়া পাঁচিল।শ্যাওলা পড়া মন্দির।পুকুরের ভাঙা ঘাট।পুরনো মন্দির। চারিদিকেই দেখবেন ধূলি-ধূসরতা;আবর্জনার স্তুপ! পতিত জায়গায় আগাছার জঙ্গল।এরই মধ্যে এক জায়গায় পাবেন এক পুরনো বৃদ্ধ বট,শাখা-প্রশাখা জীর্ণ, গোড়াটা বাঁধানো, তাতেও দেখবেন অনেক ফাটল।এইটি গ্রামের ষষ্ঠীতলা।"

এই বর্ণনা সামন্ততন্ত্রের জমিদারির কবিরাজির অস্ত যাওয়ার বার্তা বয়ে এনেছে। সেইসঙ্গে ঘোষিত হয়েছে নতুনের বার্তা

"এইটিই হল বাজারপাড়া। প্রাণস্পন্দনে মুখরিত। মাল বোঝাই গোরুর গাড়ির সারি চলেছে,মানুষ চলেছে, কোলাহল উঠেছে,গন্ধও এখানকার বিচিত্র। বাজারটা দিন দিন বেড়ে চলেছে।...নবগ্রাম মেডিকেল স্টোর্সের ঝকঝকে বাড়ি, আসবাব, বহু বর্ণে বিভিন্ন বিচিত্র ওষুধের বিজ্ঞাপন আপনার দৃষ্টি অবশ্যই আকর্ষণ করবে। বুশশার্ট প্যান্ট পরা হরেন ডাক্তারকে গলায় স্টেথোসকাপ ঝুলিয়ে বসে থাকতেও দেখতে পাবেন। “

দেবীপুর গ্রামের বর্ণনা লেখক দিয়েছেন কিন্তু দেবীপুর বা নবগ্রাম কোন নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বা নির্দিষ্ট জাতির সম্মেলনে গড়ে ওঠা কোন অঞ্চল কি না বা সেই অঞ্চলের নির্দিষ্ট কোন বৈশিষ্ট্য আছে কিনা তা সম্পর্কে কোন ভৌগলিক ধারণা পাঠক কে দেওয়া হয়নি।সেই সঙ্গে উপন্যাসের চরিত্র গঠন মধ্যেও কোনো আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় না।

জীবন মশায়ের স্কুল জীবন, প্রেম,ডাক্তারি পড়ার বাসনা, ব্যর্থতা,স্ত্রীকে সম্পূর্ণরূপে না পাওয়া,পুত্রের মৃত্যু, চিকিৎসা ছেড়ে দেওয়া, সমাজসেবা, কিশোরের রাজনীতি,প্রদ্যোতের চিকিৎসা উপন্যাসের কোন ঘটনার মধ্যেই কোন অঞ্চলের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে না। কোন ঘটনার ওপর ও এলাকার নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের অনিবার্য নিয়ন্ত্রণ নেই। জীবন-জীবিকা গোষ্ঠী চেতনা মানব গোষ্ঠীর কোন জাতি বা উপজাতি প্রভাবও নেই উপন্যাসে। একটা মেলার উল্লেখ একাধিকবার আছে যদিও কিন্তু সেই মেলার বিশেষ সাংস্কৃতিক বিবরণ নেই তার উপর নির্ভর করে বা তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোন ব্যক্তি বা কাহার বেধে প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর কোন কাহিনী এই উপন্যাস নয়। কোন আর্থসামাজিক ব্যবস্থা ঋতু উৎসবের বর্ণনা অঞ্চল কত জীবনবোধ ধর্মীয় বিশ্বাস সংস্কারের কথাও কোথাও নেই।

আসলে উপন্যাস এক সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস তারাশঙ্কর তার উপন্যাসে তুলে এনেছেন একটি নির্দিষ্ট সময়ে হাজারো রকমের মানুষকে। যদিও সব মানুষ মিলেছে একটি সূত্রেই। তাহলে ব্যাধি ও মৃত্যু আসলে মৃত্যুই এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য, প্রধান আলোচ্য। আঞ্চলিক উপন্যাসের আর একটি অন্যতম বিষয় হল ভাষা। আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার। কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষার ব্যবহার উপন্যাসের আবহকে পরিবর্তিত করে দেয়। কিন্তু এই উপন্যাসে সেই ভাষারীতি প্রবাদ-প্রবচন বিশ্বাস সংস্কার যেভাবে একটা ভৌগলিক অঞ্চলের মানুষদের চেনায় একেবারেই অনুপস্থিত।

সুতরাং আঞ্চলিক উপন্যাসের সামান্য বহিরাবরণ থাকলেও আরোগ্য নিকেতন কোন দিক থেকেই আঞ্চলিক উপন্যাস নয় বরং অন্যান্য উপন্যাসের মতো অনেক বেশি সামাজিক পারিবারিক মনস্তাত্ত্বিক মূলক উপন্যাস।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১. এই উপন্যাসটি কি আঞ্চলিক উপন্যাস?

উত্তর---আরোগ্য নিকেতন যথার্থ আঞ্চলিক উপন্যাস নয়।

মন্তব্য

রাঢ় অঞ্চল কে উপন্যাসে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের ভূমিকা সর্বাধিক।রাঢ়ের মানুষের কথা যেমন তিনি বলেছেন,তেমনি বলেছেন রাঢ়ের লাল রুক্ষ কাঁকুড়ে মাটি, তার আঁকাবাঁকা নদনদী, গাছপালা,কৃষি বাণিজ্যের কথা। সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃতি প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।

আরোগ্য নিকেতন এর ক্ষেত্রেও এরূপ দেখা যায়। এই উপন্যাসের মূল বক্তব্য হলো মৃত্যুচেতনা। মৃত্যুর অনিবার্যতা বা বৈচিত্র এবং তার সঙ্গে ব্যাধি রোগ এবং আরোগ্য প্রয়াস এরই কাহিনী। একই সঙ্গে জুড়ে গেছে কাল চেতনা। চিকিৎসা পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে এসেছে নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্ব। যেখানে কবিরাজি এবং অ্যালোপ্যাথি দ্বন্দ্ব দেখা গেছে। উপন্যাসে দেখা যায় কবিরাজি কেবল গাছপালা জড়িবুটি উপর নির্ভরশীল নয় একটি বস্তু অতিরিক্ত আধ্যাত্মিক চেতনার উপর নির্ভরশীল। জীবন-মৃত্যুর অনিবার্য সংঘাত জয় পরাজয়। নাড়ির স্পন্দনে ধ্বনিত হয় মৃত্যুর সংকেত। আর অ্যালোপ্যাথি জানে বস্তুকে জীবাণুকে ধ্বংস করার অতি আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক কৌশল। এখানে তারাশঙ্কর যেমন জীবন মশাইয়ের গল্প বলতে চেয়েছেন। তেমনি প্রদ্যোত ও তার কালকেও অস্বীকার করেননি তিনি। বিজ্ঞানের আবিষ্কার এর কাছে মাথা নত করেছে তাঁর কবিরাজ।

২. জীবন মশায়ের চোখে মৃত্যু কীভাবে ধরা দিয়েছে?

উত্তর- জীবন মশায়ের মত চিকিৎসকের চোখেও তাই মৃত্যু একদিন এইভাবে ধরা দিয়েছিল-

"মরণ টেনে নিয়ে চলেছে জীবনকে। একেবারে এলোকেশী এক ভয়ঙ্করী। হাত বাড়িয়ে ছুটেছে গ্রাস করবে অনন্ত ক্ষুধা। আর পৃথিবীর জীবকুল ভয় পাগলের মত ছুটছে।ছুটতে ছুটতে এলিয়ে পড়ছে,মৃত্যু তাকে গ্রাস করছে। অহরহই ওই তাড়ায় তেড়ে নিয়ে যাচ্ছে মৃত্যু! এখানে ভগবানের নাম করে তাকে ডেকে ভরসা সঞ্চয় ছাড়া কি করবে মানুষ?"

১৪.৪ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. উপন্যাসটি কে কি আঞ্চলিক উপন্যাস বলা যায় যুক্তিসহ লেখ।

২. আরোগ্য নিকেতন উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা আলোচনা কর।

৩. উপন্যাসের মৃত্যুচেতনার দিকটি আলোচনা করো।

১৪.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১. বাংলা উপন্যাসে কালান্তর- সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা- শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : কালিন্দী- ড.সমরেশ মজুমদার।

৪. জনগণ নয় গণদেবতা- অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

৫.বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা- ভূদেব চৌধুরী।

৬. তারাশঙ্কর বিচিত্রা- বিশ্বনাথ দে (সম্পাদিত)।